বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী

ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা
মুহম্মদ জাফর ইকবাল
© : প্রফেসর ড. ইয়াসমীন হক

চতুর্থ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৩
তৃতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৩
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৩

সময়
সময় ৯২১

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
সময় প্রিন্টার্স, ২২৬/এ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র

BLACKHOLER BACCHA (Kid of Blackhole)) a Science fiction by Muhammed Zafar Iqbal. First Published: February Bookfair 2013 by Farid Ahmed. Somoy Prakashan, 38/2ka Banglabazar, Dhaka.

Web : www.somoy.com E-mail : fahmed@somoy.com

Price : Tk. 200.00 Only

ISBN 978-984-90183-4-6 Code : 921

নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র : **'সময় . . .'** প্লাজা এ. আর (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন) ধানমন্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন: ৯১১ ৬৮৮৫

উৎসর্গ

প্রিয় নিষাদ ও নিনিত

(একদিন তোমরা জানবে
তোমার বাবা এই দেশের মানুষকে
যত আনন্দ দিয়েছে তার একটু খানিও
যদি কারো জীবনে ফিরে আসে তাহলে
এক জন্মেও সেটি শেষ হবে না।)

আমরা যে ছোট শহরটাতে থাকি সেখানে একটা খুব হাইফাই স্কুল আছে–স্কুলটার নাম অক্সব্রীজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। অক্স মানে হচ্ছে ষাঁড় আর ব্রীজ মানে হচ্ছে পুল, তার মানে অক্সব্রীজ হচ্ছে ষাঁড়ের পুল। ষাঁড় দিয়ে কেমন করে পুল তৈরী করে আর একটা স্কুলের নামে কেন ষাঁড় শব্দটা থাকতে হবে সেটা আমরা কোনোদিন বুঝতে পারি নাই। তখন একদিন বগা খবর আনল যে আসলে অক্সব্রীজ শব্দটা তৈরী হয়েছে অক্সফোর্ড আর ক্যামব্রীজ একত্র করে। অক্সফোর্ড আর ক্যামব্রীজ নাকী লন্ডন না আমেরিকা না জাপানের খুব বড় বড় স্কুল, আর আমাদের শহরের অক্সব্রীজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলও একদিন অক্সফোর্ড আর ক্যামব্রীজ থেকেও বিখ্যাত হয়ে যাবে তাই আগে থেকেই এইভাবে নাম রাখা হয়েছে। এই স্কুলের ছেলেমেয়েদের দেখলে অবশ্যি মনে হয় তাদের স্কুল বুঝি এখনই অক্সফোর্ড আর ক্যামব্রীজ থেকেও বিখ্যাত হয়ে গেছে। এই স্কুলের ছেলেমেয়েদের অবশ্যি রাস্তাঘাটে খুব বেশী দেখা যায় না, তার কারণ এই স্কুলে শুধু বড়লোকের ছেলেমেয়েরা পড়ে আর বড়লোকের ছেলেমেয়েরা সবসময় গাড়ী করে স্কুলে যায় আসে। যদি কখনো কোনো কারণে তাদের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হয় তখন তাদের দেখলে মনে হয় তাদের চারপাশে বুঝি ময়লা আবর্জনা রোগ জীবানু ভাইরাস আর তারা খুব সাবধানে নাক মুখ কুচকে রোগ জীবানু ভাইরাস ময়লা আবর্জনা বাঁচিয়ে কোনোমতে হেঁটে যাচ্ছে।

অক্সব্রীজ স্কুলের ছেলেমেয়েরা যেহেতু সবাই বড়লোকের ছেলেমেয়ে তাই তাদের চেহারায় তার স্পষ্ট ছাপ আছে। তারা সবাই গোলগাল নাদুসনুদুস, তাদের গায়ের রং সাদা তেলাপোকার মত ফর্সা, তাদের ঠোঁটগুলো চিকন আর চোখগুলো সরু। সেই সরু চোখে মাত্র দুইটি জিনিষ, আমাদের জন্যে তাচ্ছিল্য আর তাদের নিজেদের জন্যে অহংকার। অক্সব্রীজ স্কুলের ছেলেমেয়েদের সাথে আমাদের কখনো সরাসরি কথা হয় নাই কিন্তু

আমি তাদের নিজেদের মাঝে কথা বলতে শুনেছি। মনে হয় তারা বাংলায় কথা বলতে পারে না তাই সব সময় ইংরেজীতে কথা বলে। মাঝে মাঝে যখন বাংলায় কথা বলে তখন মনে হয় তাদের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। ঠোঁটগুলো চেপে রেখে কেমন জানি নাক দিয়ে কথা বলে। বাংলাদেশকে তারা বলে ব্যাংলাদেশ, করতে পারি কে বলে কোড়তে পাড়ি, টমেটোকে বলে টোমাটো। তাদের হাইফাই স্কুলের মতো পোষাকটাও অনেক হাইফাই। ধবধবে সাদা শার্ট, কুচকুচে কালো প্যান্ট, সাদা মোজা, কালো জুতো, সু আর টকটকে লাল টাই। শুধু যে ছেলেরা টাই পরে তা নয় মেয়েরাও টাই পরে। এক কথায় বলা যায় অক্সব্রীজ স্কুলের ছেলেমেয়েদের চুলের ডগা থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত পুরোটুকুর মাঝে একটা চকচকে ঝকঝকে ভাব।

বোঝাই যাচ্ছে এই ছেলেমেয়েগুলোকে দেখে আমাদের অনেক হিংসা হয়, কিন্তু আমরা সেটা কখনো প্রকাশ করি না। আমরা তাদের চোখের কোনা দিয়ে দেখলেও সব সময় ভাণ করি তাদেরকে দেখি নাই। যদি কখনো দেখতেই হয় তাহলে মুখের মাঝে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী ফুটিয়ে তাদের দিকে তাকাই। এ ছাড়া আমাদের অবশ্যি কোনো উপায়ও নেই কারণ আমাদের স্কুলটা অক্সব্রীজ স্কুলের ঠিক উল্টো। অক্সব্রীজ স্কুলের সবকিছু যেরকম হাইফাই আমাদের স্কুলের সবকিছু সেরকম ল্যাটাপ্যাটা। যেমন আমাদের স্কুলের নাম হচ্ছে হাজী মহব্বতজান উচ্চ বিদ্যালয়। স্কুলের যে অবস্থা, এর নাম হওয়া উচিৎ ছিল পাজী মহব্বতজান নিম্ন বিদ্যালয় ! মহব্বতজান হচ্ছে এই এলাকার এক বিশাল সন্ত্রাসী, থানায় তার নামে কম করে হলেও এক ডজন খুনের মামলা আছে। তার মিশমিশে কালো রং, টকটকে লাল চোখ, আর পান খাওয়া ক্যাটক্যাটে হলুদ দাঁত। মাথা ফুটবলের মতন~ একটা চুলও নাই। মাথায় চুল গজায় না নাকী সে কামিয়ে ফেলে সেটা কেউ জানে না। সন্ত্রাসী মহব্বতজান হঠাৎ একদিন হজ করে চলে এল, তখন তার চেহারার একটু পরিবর্তন হল, থুতনীতে কয়েকটা দাড়ি আর মাথায় একটা টুপি, নাম হয়ে গেল হাজী মহব্বতজান। কী তার মতলব কে জানে, মানুষের জমি দখল করে সেখানে একটা স্কুল, দুইটা মাদ্রাসা আর একটা কলেজ বানিয়ে ফেলল। তার বানানো সেই স্কুলটাই হচ্ছে আমাদের এই স্কুল। এই শহরে তার নামে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ছাড়াও আছে মহব্বতজান মার্কেট, মহব্বতজান কোল্ড স্টোরেজ আর মহব্বতজান ইটের ভাটা। এই শহরের সবচেয়ে যেটা ভয়ংকর সেটা হচ্ছে তার নামে একটা দৈনিক পত্রিকা,

সেটার নাম হচ্ছে দৈনিক মহব্বত। সেই পত্রিকায় হাজী মহব্বতজানের নানা রকম ভালো ভালো খবর ছাপা, যে খবরে তার নামের আগে লেখা হয় দানবীর হাজী মহব্বতজান।

আমাদের স্কুলের কোনো পোষাক নাই যার যা ইচ্ছা পরে চলে আসে। বগা দাবী করে একটা নাকী পোষাক আছে লাল পায়জামা বেগুনী সার্ট কিন্তু সেটা কেউ প্রমান করতে পারে নাই। আমাদের স্কুলে কোনো লেখাপড়া হয় না। আমরা স্কুলে আসি কথাবার্তা বলি। গল্পগুজব করি, ঝগড়াঝাটি মারামারি করি তারপর ধীরে সুস্থে বাসায় যাই। কোনো কোনো ক্লাশে স্যার ম্যাডাম আসেন। তাদের মাঝে বেশীরভাগই হয় মোবাইলে কারো সাথে কথা বলেন, তা না হলে চেয়ারে পা তুলে বসে বসে ঘুমান। অন্যরা পড়ানোর নামে আমাদের বেত দিয়ে পিটান। আমাদের স্কুলে যে কোনো ছেলে মেয়ে যে কোনো ক্লাশে ভর্তি হতে পারে, তাই যারা অন্য কোনো স্কুলে ভর্তি হতে পারে না— তারা আমাদের স্কুলে এসে ভর্তি হয়। অন্য স্কুল থেকে যাদেরকে টিসি দিয়ে বিদায় করে দেয়া হয় তারা সবাই আমাদের স্কুলে এসে ভর্তি হয়। কেউ অবশ্যি বেশীদিন থাকে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের বাবা মায়েরা তাদেরকে অন্য একটা স্কুলে নিয়ে যায়। আমরা যে কয়জন অনেকদিন থেকে এই স্কুলে আছি তাদের বাবা মায়েদের আসলে আমাদের জন্যে কোনো মাথা ব্যথা নেই।

যেমন ধরা যাক আমাদের রুম্পার কথা। তার বাবা মা আছে না নাই, থাকলেও কোথায় আছে সেটা কেউ জানে না। রুম্পা তার মামীর বাসায় থাকে, মামা মামী অপেক্ষা করছে কখন সে একটু বড় হবে, তখন ঝপ করে তাকে বিয়ে দিয়ে আপদ বিদায় করে দেবে। তবে কাজটা খুব সহজ হবে না। ঝুম্পাকে কেউ যদি জোর করে বিয়ে দিতে চায়, তাহলে ঝুম্পা শুধু যে তার নূতন জামাইকে মার্ডার করে ফেলবে তা নয়। নূতন শ্বশুর শাশুড়ী এমনকি বিয়ের কাজী আর উকিল বাবাকেও মার্ডার করে ফেলবে। আমি পরিষ্কার দেখতে পাই পত্রিকার হেডলাইন হবে এরকম : "হিংস্র নববধূ কর্তৃক জামাতা ও শ্বশুর শাশুড়ী খুন। মৃত্যুর সাথে লড়ছেন কাজী এবং উকিল বাবা।" কিংবা "রক্ত পিপাসু নববধূ, বিয়ের আসরে গণহত্যা।" অনেকেই মনে করতে পারে কথাগুলো বাড়িয়ে চাড়িয়ে বলা হচ্ছে—আসলে এক বিন্দুও বাড়ানো হয়নি। যেমন ধরা যাক গত সপ্তাহের ঘটনাটা, ঝুম্পা স্কুলে আসছে চৌরাস্তার মোড়ে ভিডিওর দোকানের সামনে একটা লাফাংরা ছেলে ঝুম্পাকে

লক্ষ্য করে কী একটা বাজে কথা বলল। অন্য যে কোনো মেয়ে হলে কথাটা না শোনার ভান করে হেঁটে চলে যেতো, ঝুম্পা সেরকম পাত্রই না, ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "এই পাংকু, তুই কী বললি?

ছেলেটা একবারে হকচকিয়ে গেল, সে কল্পনাও করতে পারেনি একা একটা মেয়ে এইভাবে কথা বলবে। ছেলেটা মাস্তান টাইপের, নিজেকে সামলে নিয়ে হলুদ দাঁত বের করে হাসার ভাণ করে বলল, "শুনতে ভালো লেগছে? আবার শুনবার চাও?"

ঝুম্পা তখন তার ব্যাগটা নিচে রেখে সেখান থেকে একটা লাল রুমাল বের করে মাথার মাঝে বাঁধল, তারপর ওড়নাটা কোমরে পেঁচিয়ে নিয়ে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একজন মানুষকে বলল, "আংকেল, আমার ব্যাগটা একটু দেখবেন।" তারপর দুই হাত দিয়ে ছেলেটার চোখ দুটি তুলে নেবার একটা ভঙ্গী করে এগিয়ে গেল।

ঝুম্পার চেহারা ভালো না খারাপ সেটা আমরা কেউই পরিষ্কার ভাবে বলতে পারি না, অন্য দশটা মেয়ের মত চুলে শ্যাম্পু ট্যাম্পু দিয়ে সেজেগুঁজে থাকলে মনে হয় ভালো হিসাবে চালানো যায়, কিন্তু যে যখন মাথার মাঝে লাল রংয়ের একটা রুমাল বেঁধে দাঁত কিড়মিড় করে এগিয়ে যায় তখন তার দুই চোখের দিকে তাকালেই মানুষের আত্মা উড়ে যায়। মাস্তান ছেলেটারও আত্মা উড়ে গেল, তাই নূতন কোনো গোলমাল না করে সে সরে পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সে সরে যাবার চেষ্টা করলেই তো হবে না, ঝুম্পারও তো তাকে সরে যেতে দিতে হবে। ঝুম্পা তাকে সরে যেতে দিল না, পিছন পিছন গিয়ে বলল, "এই পাংকু, কই যাস? কী বললি আরেকবার বল দেখি।"

পাংকু আরেকবার বলার কোনো আগ্রহ দেখাল না, তাড়াতাড়ি হেঁটে পাশের গলিতে ঢোকার চেষ্টা করল, পিছন পিছন ঝুম্পাও এগিয়ে গেল, পাংকু তখন নার্ভাস হয়ে দৌড় দেবার চেষ্টা করল ঝুম্পা তখন হুংকার দিয়ে বলল, "ধর পাংকুকে" তারপর তাকে ধাওয়া করল। চৌরাস্তা থেকে ধাওয়া করে মহব্বত মার্কেটের সিঁড়ির তলায় ঝুম্পা শেষ পর্যন্ত পাংকুকে মাটিতে চেপে ধরেছিল। মাথায় লাল রুমাল বাঁধা একটা মেয়ে লাফাংরা টাইপের একটা ছেলেকে প্রায় এক কিলোমিটার ধাওয়া করে একটা মার্কেটের সিঁড়ির নিচে চেপে ধরার ঘটনা প্রতিদিন ঘটে না, তাই কিছুক্ষণের মাঝেই সেখানে অনেক ভীড় জমে গেল এবং সবাই মিলে ছেলেটাকে উদ্ধার করল, তা না হলে সেই ছেলের কপালে অনেক দুঃখ ছিল।

কেউ যেন মনে না করে আমাদের স্কুলের সব মেয়েই ঝুম্পার মতোন জঙ্গী টাইপের, সেটা সত্যি নয়। ঝুম্পা একটু বেশী অন্যরকম। অন্য মেয়েরা প্রায় স্বাভাবিক, যেমন ফারা খুবই নরম স্বভাবের মেয়ে, হাসিখুশী, মিষ্টি স্বভাবের, পৃথিবীর সবার জন্যে তার ভালোবাসা— দেখে মনে হয় সে বুঝি একটা ছোটখাটো মাদার টেরেসা, শুধু মাত্র বেগম রোকেয়াকে সে দুই চোখে দেখতে পারে না। তার নাম শুনলেই সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে, দাঁত কিড়মিড় করে বলে, "এই মহিলার জন্যে আজ আমার এই অবস্থা।"

প্রথমবার যখন শুনেছিলাম তখন আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কী অবস্থা? বেগম রোকেয়া কী করেছেন?"

"কী করেছেন মানে? তার জন্যেই তো মেয়েদের লেখাপড়া করতে হচ্ছে। না হলে আজ আমরা কতো আরামে থাকতে পারতাম। কোনো লেখাপড়া করতে হতো না।"

ফারা যখন এটা বলছে তখন দেখলাম অনেক মেয়ে মাথা নাড়ছে, ভাগ্যিস বেগম রোকেয়া বেঁচে নাই। বেঁচে থাকলে এই দৃশ্য দেখলে নিশ্চয়ই অনেক মন খারাপ করতেন।

একদিক দিয়ে মেয়েদের অবস্থা আমাদের থেকে ভালো, তারা বেগম রোকেয়াকে দোষ দিয়ে মনটা হালকা করতে পারছে, আমাদের সেই কপাল নাই, কাউকে দোষ দিতে পারি না। তবে এই ব্যাপারে বগার একটা থিওরি আছে। বেগম রোকেয়ার উপর ফারা আর অন্যান্য মেয়েরা যতই রেগে থাকুক এখন নাকী তারাই বেশী লেখাপড়া করছে। বগা বলেছে সে নাকী কোন পত্রিকায় পড়েছে যে লেখাপড়াটা আস্তে আস্তে মেয়েদের কাছে চলে যাচ্ছে, এই ভাবে আর কিছুদিন গেলে নাকী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, পুলিশ, মিলিটারি, জজ, ব্যারিস্টার, অফিসার সব কিছু হবে মেয়ে। তখন ছেলেদের আর কিছুই করতে হবে না। ভালো দেখে চালাক চতুর একটা মেয়েকে বিয়ে করে ফেললেই সারা জীবনের জন্যে নিশ্চিন্ত। মেয়েটা চাকরী বাকরী করে টাকা পয়সা উপার্জন করবে, ছেলেরা বাসায় বসে বসে স্পোর্টস চ্যানেলে ক্রিকেট না হলে কুস্তি দেখবে। বগার কথাটা সত্যি হলে খারাপ হয় না, তাহলে আমাদের এতো কষ্ট করে আর লেখাপড়া করতে হবে না।

তবে বগার কথাটা কতটুকু বিশ্বাস করা যায় জানি না— বগা অবশ্যি আমাদের মত এতো গুলপট্টি মারে না, সে খুবই সিরিয়াস। আমার মনে হয় সেটা হয়েছে তার নামটার কারণে। একজন মানুষের সাথে নামের এতো

মিল থাকতে পারে সেটা বগাকে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না, বগা দেখতে হুবহু একটা বকের মতো। শুকনা, পাতলা, লম্বা লম্বা ঠ্যাং, লম্বা একটা গলা, গলার মাঝে উঁচু কণ্ঠার হাড়, নাকটা শুধু লম্বা না, লম্বা হয়ে একটু বাঁকা হয়ে গেছে গায়ের রং বকের মতো সাদা। বগা হাঁটেও বকের মত লম্বা লম্বা পা ফেলে। বগা নাম রাখার কারণে বগার চেহারা বকের মত হয়েছে নাকী জন্ম হবার পর তার মা-বাবা দেখেছে বাচ্চার চেহারা বকের মতন সেই জন্যে তার নাম রেখেছে বগা সেটা কেউ পরিষ্কার করে জানে না।

ঝুম্পা ফারা আর বগা ছাড়াও আমাদের ক্লাশে আরো অনেক ছেলেমেয়ে আছে যাদের যে কোনো একজনকে নিয়ে একটা আস্ত বই কিংবা তেরো পর্বের টিভি সিরিয়াল লেখা যায়। যেমন আমাদের গুললু, সে সাইজে বেশী বড় না কিন্তু তার হাত পা ঘাড় মাথা পেট সবকিছু মনে হয় স্টীলের তৈরি। শুধুমাত্র গুললু সেন্টার ফরোয়ার্ডে খেলে বলে প্রত্যেক বছর আমাদের স্কুল ফুটবল খেলায় ফাইনাল পর্যন্ত উঠে যায়। গুললু যখন বল পায় তখন সে যেভাবে বলটাকে নিয়ে এগিয়ে যায় সেটা দেখলে মনে হয় একটা ট্যাংক এগিয়ে যাচ্ছে। তার ধারে কাছে কেউ আসতে পারে না, না বুঝে যদি কোনো প্লেয়ার চলে আসে তখন গুললুর হাত পা কিংবা ঘাড়ের একটা ঝটকা খেয়ে সে দশ হাত দূরে ছিটক পড়ে। খেলা শুরু হবার কিছুক্ষণের ভিতর রেফারী লাল কার্ড দিয়ে গুললুকে বের করে দেয়। লাল কার্ড দেওয়ার আগে গুললু যদি গোটা চারেক গোল দিয়ে ফেলতে পারে তাহলেই সাধারণত আমরা চ্যাম্পিয়ান হয়ে যাই। আমাদের হাজী মহব্বতজান উচ্চ বিদ্যালয় এই ফুটবল খেলা ছাড়া আর কোনো কিছুতে যেতে পারে না। কবিতা আবৃত্তি, রচনা প্রতিযোগিতা, ডিবেট, নাটক, গান, ছবি আঁকা, গণিত অলিম্পিয়াড এই ধরণের কোনো কিছুতে আমাদের স্কুলের কেউ কোনোদিন কোনো পুরস্কার পায় নাই, শুধু গুললুর কারণে আমরা মাঝে মাঝে ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন আর রানার্স আপ হয়েছি। এমনিতে গুললুর মেজাজ খুব গরম তাই মারপিট হাঙ্গামা করে সে যদি জেলখানায় চলে না যায় তাহলে আজ থেকে দশ বছর পর সে নিশ্চয়ই এই দেশের ন্যাশনাল ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন হয়ে যাবে। হবেই হবে।

তারপর যেমন ধরা যাক রোল নম্বর তেতাল্লিশের কথা, সে কোনোদিন কোনো কথা বলে না, সে শুধু কথা শোনে। আমরা তার নামও জানি না। রোল নম্বর তেতাল্লিশের চোখ বরফের মত ঠাণ্ডা, সে কী বোকা না বুদ্ধিমান,

রাগী না শান্ত আমরা তার কিছুই জানি না। তার মনের ভিতরে কী আছে আমরা তার কিছুই অনুমান করতে পারি না সেইজন্যে আমরা ভিতরে ভিতরে সবাই তাকে একটু ভয় পাই। গুললু পর্যন্ত রোল নম্বর তেতাল্লিশকে ঘাটায় না। সে বড় হয়ে কী হবে সেটা নিয়ে আমাদের নিজেদের ভিতরে দুইটা ভাগ আছে। এক ভাগ মনে করে সে বড় হয়ে সিরিয়াল কিলার হবে আরেক ভাগ মনে করে সে অনেক বড় দার্শনিক হবে। শুধু বগার ধারণা রোল নম্বর তেতাল্লিশ দিনের বেলা দার্শনিক আর রাতের বেলা সিরিয়াল কিলার হবে।

মেয়েদের ভিতরে মৌসুমীর কথাও বলা যায়। সে কী হবে এখনো ঠিক করতে পারে নাই— কিন্তু মোটামুটি গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় যে লেখাপড়া না করে যা কিছু হওয়া সম্ভব সে তার যে কোনোটাই হতে পারবে। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে একজন মাদক সাম্রাজ্ঞীর খবর পড়ে তার ইচ্ছে ছিল সে মাদক সম্রাজ্ঞী হবে। এখন সে তার মত বদলে ফেলে নায়িকা হবার পরিকল্পনা করেছে। মোটামুটি অনুমান করা যায় এটাও বেশীদিন থাকবে না কয়দিন পরেই হয়তো বলবে সে বুটিকের দোকান দিবে।

আমাদের ক্লাশে এই রকম আরো অনেক আছে সে সবার কথা বলে শেষ করা যাবে না। জুননুন যেরকম ঠিক করেছে বড় হয়ে একটা খানকায় শরীফ দিয়ে পীর হয়ে যাবে। লাখ খানেক মুরীদ যদি করে ফেলতে পারে তাহলে তার আর টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। পীর কেমন করে হতে হয়, পীর হওয়ার আলাদা স্কুল আছে কী না, সেখানে জিপিএ ফাইভ পেয়ে পাশ করতে হয় কি না সেটা জুননুনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারে নাই। তবে তার ভাবভঙ্গী দেখে বোঝা গেল— যদি সে পীর হতে না পারে তাহলে শীর্ষ সন্ত্রাসী হয়ে যাবে— তার টাকা পয়সার অনেক দরকার। হাজার হাজার না, লাখ লাখও না তার দরকার কোটি কোটি টাকা। জুননুন ছাড়াও আমাদের ক্লাশে আছে বাপ্পা, তার মত মিথ্যা কথা আর কেউ বলতে পারে না। চোখের পাতি না ফেলে সে ভয়ংকর ভয়ংকর মিথ্যা কথা বলে ফেলে। মিথ্যা কথা বলতে বলতে তার এমন অভ্যাস হয়েছে যে যখন সত্য কথা বললে লাভ হয় তখনো সে মিথ্যা কথা বলে বিপদে পড়ে যায়। বাপ্পাকে দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বড় হয়ে সে নিশ্চয়ই সাহিত্যিক হবে, শুধুমাত্র যারা সাহিত্যিক তারাই মনে হয় এইভাবে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা দিয়ে বোঝাই করে বই লিখে ফেলে। যদি কোনো কারণে বাপ্পা সাহিত্যিক হতে না পারে তাহলে নিশ্চয়ই সে

রাজনীতির নেতা হয়ে যাবে। রাজনীতির নেতাদের দেখেছি সব সময় বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলতে হয়।

কাজেই দেখাই যাচ্ছে এখন আমাদের স্কুলের কোনো নাম ডাক না থাকতে পারে কিন্তু আজ থেকে পনেরো কিংবা বিশ বছর পরে আমাদের স্কুল থেকে অনেক বিখ্যাত (কিংবা কুখ্যাত) মানুষ বের হবে। ফুটবল প্লেয়ার, দার্শনিক, সিরিয়াল কিলার, মাদক সম্রাজ্ঞী, নায়িকা, পীর, শীর্ষ সন্ত্রাসী, সাহিত্যিক কিংবা নেতা এরকম অনেক কিছু তৈরী হলেও এই স্কুল থেকে কোনো বৈজ্ঞানিক বের হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করে দেখা গেল আমাদের হাজী মহব্বতজান উচ্চ বিদ্যালয় থেকে একজন খাঁটি বৈজ্ঞানিক বের হওয়ারও একটা বিশাল সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। তবে এটাকে সম্ভাবনা বলব না আশংকা বলব সেটাও অবশ্যি আমরা এখনো ঠিক জানি না।

ঘটনাটা শুরু হয়েছে এভাবে।

বুধবার রাত্রি বেলা ভয়ংকর একটা শব্দে আমাদের ছোট শহরটা কেঁপে উঠল— কিসের শব্দ কোথায় শব্দ কেমন করে শব্দ কিছুই আমরা জানতে পারলাম না। শব্দটা মনে হয় দক্ষিণ দিক থেকে এসেছে এছাড়া কিছুই টের পাওয়া গেল না। যখন কোনো কিছু জানা না যায়, তখন নানা রকম গুজব ডালপালা ছড়ায়, তাই এবারেও নানারকম গুজব শুনতে পেলাম। সবচেয়ে পানশে গুজব হচ্ছে কাছাকাছি একটা ট্রান্সফর্মার ফেটে গেছে। সবচেয়ে চমকপ্রদ গুজবটা হল চীন আর আমেরিকার মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, আমেরিকা থেকে চীনের দিকে একটা মিসাইল ছুঁড়েছে, পুরোটা যেতে পারে নাই মাঝখানে আমাদের শহরের ওপর পড়েছে। শহরের দক্ষিণ দিকটা পুরো বাতাস হয়ে উড়ে গেছে।

আমি একটু দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, অক্সব্রীজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল শহরের দক্ষিণ দিকে, সেই স্কুল বাতাস হয়ে উড়ে গেলে আমাদের কী লাভ? আমাদের স্কুল শহরের উত্তরে, যদি উত্তর দিক বাতাস হয়ে উড়ে যেতো আমাদের কিছু একটা লাভ হত।

পরদিন স্কুলে গিয়ে দেখলাম বগা এক কপি দৈনিক মহব্বত নিয়ে এসেছে, সেই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় করে হেড লাইন "প্রচণ্ড বিস্ফোরণে অক্সব্রীজ স্কুল বিধ্বস্ত। স্কুল অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা।" ভিতরে ছোট ছোট করে লেখা আনুমানিক রাত আটটা তিরিশ মিনিটে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে স্কুলের মূল ভবনটি ধ্বসে পড়েছে। কোথায় কেন কীভাবে সেটি ঘটেছে কেউ জানে না। অনুমান করা হচ্ছে স্কুলের ল্যাবরেটরিতে বিস্ফোরণের সূত্রপাত। স্কুলের গার্ড বলেছে, সে রাত আটটার দিকে দশ বারো বছরের একটি ছেলেকে দোতালার বারান্দা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছে। ল্যাবরেটরির দায়িত্বে থাকা বিজ্ঞান শিক্ষককে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ল্যাবরেটরির একটা চাবির কোনো হদিস নেই। অনেক

বড় বিস্ফোরণ হলেও কোনো মানুষ আহত হয়নি কিংবা মারা যায়নি।

খবরটা পড়ে আমাদের খুব দুঃখ হল। ঘটনাটা যদি অক্সব্রীজ স্কুলে না হয়ে আমাদের স্কুলে হতো তাহলে কী মজাই না হতো, অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্কুল বন্ধের আনন্দটাই অন্যরকম— আমি লিখে দিতে পারি অক্সবীজ স্কুলের ছেলেমেয়েরা কোনোদিন এই আনন্দ উপভোগ করতে পারবে না। বরং তাদের নিশ্চয়ই মন খারাপ যে তারা স্কুলে যেতে পারছে না।

পরের কয়েকদিন আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে দৈনিক মহব্বত পড়লাম, সেখানে একটা রহস্যময় বালকের কথা লেখা হল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিষয়টা ধামাচাপা দিয়ে রাখল। আমরা একদিন অক্সবীজ স্কুলটা দেখে এলাম, তাদের সুন্দর বিল্ডিংয়ের বড় অংশ এখনো ধ্বসে পড়ে আছে। কবে সেই স্কুল আবার দাড়া হবে কে জানে।

এর দুইদিন পর আমাদের স্কুলে একটা নূতন ছেলে ভর্তি হল। আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েরা যেহেতু লেখাপড়া করে না— তাই কখনো তাদের চোখ খারাপ হয় না। সেজন্যে আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েদের কারো চোখে চশমা নেই। আমাদের স্কুলে যে নূতন ছেলেটা ভর্তি হল তার চোখে চশমা এবং দেখেই বুঝতে পারলাম তার চশমার অনেক পাওয়ার। ছেলেটার জামা কাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শুধু তাই না আমরা দেখলাম তাকে একটা গাড়ী থেকে নামিয়ে দেয়া হল। স্কুলে ঢোকার আগে গাড়ী থেকে নেমে একজন মহিলা— নিশ্চয়ই ছেলেটার মা— অনেকক্ষণ ছেলেটায় সাথে কথা বললেন। দূর থেকে কথা শোনা যাচ্ছিল না, আমরা শুধু অনুমান করতে চেষ্টা করলাম কী বলছেন। ঝুম্পা বলল, "বলছেন, এই বাদমাইস পাজীর পা ঝাড়া একটান দিয়ে তোর কল্লা ছিড়ে ফেলব, ঘুষি মেরে তোর ভূড়ি ফাঁসিয়ে দেব। তোর মতো অপদার্থ বেজন্মাকে জন্ম দেওয়ার কারণে আজকে আমার এতো বড় অপমান, মহব্বতজান স্কুলে তোকে ভর্তি করাতে হচ্ছে, চৌদ্দ গুষ্ঠির সামনে আমি মুখ দেখাতে পারব না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ!"

ফারা বলল, "উহুঁ, মায়ের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে মা এরকম খারাপ খারাপ কথা বলতে পারেন না। আমার মনে হয় মা বলছেন, আমি তোকে নিয়ে আর পারি না। বাবা তুই আর আমাকে কতো জ্বালাতন করবি? তোর অন্য ভাইবোন তো তোর মতো না। তারা ঠিকমত লেখাপড়া করে ভালো ব্যবহার করে। তুই কেন এরকম? এই শহরে কী আরো এক ডজন

ভালো স্কুল নাই? তাহলে তোকে কেন মহব্বতজান স্কুলে ভর্তি করতে হচ্ছে?"

বগা বলল, "আমার কী মনে হয় জানিস? আমার মনে হয় মা বলছেন, তোর চেহারা দেখে কেউ অনুমান করতে পারবে তুই এতো দুষ্টু? ভালোমানুষের মত চেহারা, আর তলায় তলায় এতো দুষ্টুমি? তোকে কোনো ভদ্র স্কুল নিতে রাজী হচ্ছে না— শেষ পর্যন্ত মহব্বতজান স্কুলে এনে ভর্তি করতে হচ্ছে? আমি এখন কোথায় যাব?"

আমি কিছু বললাম না, ছেলেটাকে দূর থেকে ভালো করে লক্ষ্য করলাম। মা যখন তার সাথে কথা বলছে তখন তাকে দেখে মনে হলো কথাগুলো তার এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। কথাগুলো মনে হয় সে শুনছেই না কিংবা শুনলেও বুঝছে না। ছেলেটা কেমন যেন উদাস উদাস ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। মাঝে মাঝেই ডান হাতটা তুলে বুকের কাছে নিয়ে আসছে। মনে হয় পকেটে কিছু একটা আছে যেটা একটু পরে পরে হাত দিয়ে দেখছে সেটা আছে না চলে গেছে। মা বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে ছেলেটাকে ছেড়ে দিলেন তখন ছেলেটা স্কুলের দিকে এগিয়ে এল। সে কোন ক্লাশে ভর্তি হবে আমরা তখনো জানি না, তাই তাকিয়ে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

মহব্বতজান স্কুলের কোনো ছিরি ছাদ নাই, কোনটা কোন ক্লাশ সেটা কোথাও লেখাও নাই। শুধু তাই না, ক্লাশ রুম গুলো সাজানোও নাই, ক্লাশ থ্রীয়ের পাশে ক্লাশ এইট, সেভেনের পাশে টেন এরকম। কেউ যদি না জানে কোনোভাবেই সে তার ক্লাশ খুঁজে পাবে না। আমাদের স্যার ম্যাডামেরাও খুঁজে পান না, তাই তারা মাঝে-মধ্যে ভুলভাল ক্লাশে এসে বসে থাকেন, কিন্তু তারা যেহেতু কোনো কিছু পড়ান না কারো কোনো সমস্যা হয় না। একবার জলীল স্যার আমাদের বেদম পিটাচ্ছিলেন, আমি স্পষ্ট শুনলাম স্যার বিড়বিড় করে বলছেন, "এতো বড় বড় ছেলেমেয়ে এখনো ক্লাশ থ্রীতে পড়ে!" আমরা তখন ক্লাশ এইটে পড়ি।

যাই হোক ছেলেটাকে খুবই বিভ্রান্ত দেখা গেল, তখন হঠাৎ সে আমাদেরকে দেখতে পেল। সে আবার ডান হাতটা তার বুকের কাছে ধরে বুক পকেটের জিনিসটা পরীক্ষা করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে, কাছাকাছি এসে চশমার ফাঁক দিয়ে আমাদেরকে এক নজর দেখে বলল, "ক্লাশ এইট কোনটা বলতে পার?"

বগা জিজ্ঞেস করল, "তুমি ক্লাশ এইটে পড়?"

ফারা বলল, "তোমাকে যে নামিয়ে দিলেন, উনি কী তোমার আম্মু? যা সুইট !"

ঝুম্পা জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী?"

আমি বললাম, "তোমার পকেটে কী?"

ছেলেটা ঝট করে সোজা হয়ে গেল, তারপর কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। বোঝাই যাচ্ছে পকেটে যে জিনিষটা আছে সেটার কথা সে কাউকে জানাতে চায় না। আমি ছেলেটার চোখের দিকে তাকালাম। মুখ দিয়ে কোনো কথা না বলে শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়েও কথা বলা যায়, আমি তখন চোখের দৃষ্টি দিয়ে ছেলেটাকে বললাম, "আমি জানি তোমার পকেটে যে জিনিষটা আছে সেটা গোপন এবং মনে হয় বেআইনী। কিন্তু তোমার কোনো ভয় নাই, তুমি আমাদেরকে সেটা বলতে পার। আমরা কাউকে বলব না।"

ছেলেটি কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তার চোখে প্রথমে এক ধরণের ভয় দেখা গেল— আস্তে আস্তে ভয়টা একটু কমে এল। তখন সে বগার দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ, আমি ক্লাশ এইটে পড়ি।" তারপর সে ঘুরে ফারার দিকে তাকাল, বলল, "হ্যাঁ আমার মা আমাকে নামিয়ে দিয়েছে।" তারপর সে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল, সেটাকে একটা দীর্ঘশ্বাসের মত শোনাল। বলল, "সবার ধারণা আম্মু খুব সুইট আসলে আম্মুর মেজাজ খুবই গরম। আমাকে ঝাড়ি দেওয়া হচ্ছে আম্মুর হবি।" কথা শেষ করে সে ঝুম্পার দিকে তাকাল, বলল, "আমার নাম মিঠুন"। সবার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সে আমার দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস্ করল, "আমার পকেটে কিছু একটা আছে সেটা তুমি কেমন করে বুঝতে পেরেছ?"

আমি বললাম, "না বোঝার কি আছে? তোমার চালুক চুলুক ভাব দেখলেই বোঝা যায়।"

"চালুক চুলুক?"

"হ্যাঁ। বোঝাই যাচ্ছে কিছু একটা বেআইনী জিনিষ আছে– লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছ।"

মিঠুন নামের ছেলেটা মাথা নাড়ল, বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ।" বলে সে শীষ দেওয়ার মত একটা শব্দ করল, আমি ভাবলাম এখন সে বলবে তার পকেটে কী আছে। কিন্তু সে বলল না চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী আছে তোমার পকেটে?"

ছেলেটা বলল, "আমি জিনিষটা তোমাদের দেখাতে পারি, কিন্তু জিনিষটা কী তোমাদের বলতে পারব না।"

"কেন?"

"কারণ আমি জানি না জিনিষটা কী।"

"তুমি জান না কী কিন্তু জিনিষটা পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

আমরা ছেলেটার কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না, কিন্তু সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। আমাদের সাথে যারা কথা বলে তাদের বেশির ভাগের কথারও মাথা মুণ্ডুও আমরা বুঝতে পারি না। আমরা কথা শোনার সময় শুধু মাথা নেড়ে যাই। অন্যেরাও আমাদের কথার মাথা মুণ্ডু কিছু বুঝতে পারে না– আমরা একটা জিনিষ বলি তারা অন্য একটা জিনিষ বুঝে বসে থাকে। তাই চশমা পরা এই নূতন ছেলেটার কথা শুনে আমি বেশি অবাক হলাম না। সে পকেটে কী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা দেখার আমার খুব কৌতূহল হল, তাই বললাম, "জিনিষটা দেখাও।"

ছেলেটা আমাদের সবার মুখের দিকে তাকাল তারপর থমথমে গলায় বলল "কাউকে কিন্তু এটার কথা বলতে পারবে না।"

"বলব না।"

"জিনিষটা অসম্ভব গোপন। এটার জন্যে আমার লাইফের সবকিছু ওল্টাপাল্টা হয়ে গেছে।"

"ঠিক আছে।"

"তোমরা কিন্তু জিনিষটা নেয়ার জন্যে কাড়াকাড়ি করবে না। আমি ধরে রাখব, তোমরা শুধু দেখবে।"

আমি একটু অধৈর্য্য হয়ে বললাম, "ঠিক আছে বাবা! ঠিক আছে। বক্তৃতা শেষ করে এখন দেখাও।"

ছেলেটা এবারে খুব সাবধানে তার বুক পকেট থেকে কী একটা যেন বের করল, আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলাম জিনিষটা একটা ছোট শিশি। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মিষ্টি মিষ্টি ট্যাবলেট দেওয়ার জন্যে যেরকম ছোট শিশি থাকে অনেকটা সেরকম। শিশির ভিতরে কী আছে সেটা দেখার জন্যে আমি আরেকটু এগিয়ে গেলাম এবং দেখলাম কিছুই নাই। শিশিটা পুরোপুরি ফাঁকা।

জিজ্ঞেস করলাম, "কী আছে শিশির ভিতরে?"

"জানি না।"

বগা বলল, "কিছু তো নাই।"

"আছে।"

"তাহলে দেখা যায় না কেন?"

"জানি না।"

এবারে আমার সন্দেহ হল ছেলেটা নিশ্চয়ই আমাদের সাথে মশকরা করছে। চেহারা দেখে বোঝা যায় না আসলে সে নিশ্চয়ই খুবই ফাজিল টাইপের ছেলে, আমাদের বোকা বানানোর চেষ্টা করছে। আমি একটু গরম হয়ে বললাম, "তুমি আমাদের সাথে ফাজলেমী করছ?"

ছেলেটা খুবই ঠাণ্ডা গলায় বলল, "না ফাজলেমী করব কেন?"

"শিশিতে কিছু নাই, কিছু দেখা যায় না, কী আছে সেটা জান না, কেন দেখা যায় না সেটা জান না আবার বলছ আছে– এটা যদি ফাজলেমী না হয় তাহলে ফাজলেমী কী?"

ছেলেটা খুব গম্ভীরভাবে শিশিটা তার পকেটে রেখে বলল, "আমি তোমাদের আগেই বলেছিলাম, আমি জিনিষটা দেখাতে পারি কিন্তু জিনিষটা কী সেটা বলতে পারব না।"

"জিনিষটাও তো দেখা গেল না।"

"দেখা না গেলে সেটা কী আমার দোষ?"

ঝুম্পা আমাকে বলল, "ঠিক আছে ঠিক আছে ইবু, তোর আর ঝগড়া করতে হবে না। ধরে নে শিশিটাই হচ্ছে দেখার জিনিষ। শিশিটা তো দেখেছিস?"

আমি কিছু বললাম না। ছেলেটা বলল, "ক্লাস এইটটা কোনদিকে বলবে প্লীজ?"

ঝুম্পা বলল, "কোনো একটা ক্লাশ রুমে বসে যাও।"

মিঠুন নামের নূতন এই ছেলেটা চোখ কপালে তুলে বলল, "কোনো একটা ক্লাশে রুমে বসে যাব মানে?"

"এই স্কুলে ক্লাশ রুমের কোন ঠিক ঠিকানা নাই। স্যারেরা ক্লাশে আসে না। আসলেও পড়ায় না। তাই তুমি কোন ক্লাশে বস তাতে কিছু আসে যায় না। একেকদিন একটা ক্লাশে বসে দেখ কোনটা ভালো লাগে।"

আমি ভেবেছিলাম এই কথাটা শুনে ছেলেটা খুবই ঘাবড়ে যাবে– কিন্তু

সে মোটেও ঘাবড়ালো না, বরং তার চোখ মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল, হাতে কিল দিয়ে বলল, "ফ্যান্টাস্টিক!"

এবারে আমরা ঘাবড়ে গেলাম। আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, "ফ্যান্টাস্টিক?"

"হ্যাঁ। আমি সব সময় এরকম একটা স্কুলে পড়তে চেয়েছিলাম যেখানে স্যার ম্যাডামেরা উৎপাত করবে না। আমরা নিজেরা নিজেরা ইচ্ছামতন লেখাপড়া করব।"

বগা বলল, "ইচ্ছামতন লেখাপড়া? কোনোদিন কোনো ছেলেমেয়ে ইচ্ছামতন লেখাপড়া করে? বেত দিয়ে না চাবকালে কেউ পড়তে চায়?"

মিঠুন তার চশমাটা ঠিক করে বলল, "কেউ কোনোদিন সেই এক্সপেরিমেন্ট করেছে? করে দেখলে বোঝা যাবে তোমার কথা সত্যি না মিথ্যা।" মিঠুন তার গলার স্বর গম্ভীর করে বলল, "তুমি জান পৃথিবীর অনেক দেশে লেখাপড়ার মাঝে কোনো পরীক্ষা নাই।"

ফারা চোখ বড় বড় করে বলল, "সত্যি? সত্যি? কোন দেশ? আমাদেরকে সেই দেশে নিবে? আমরা সেই দেশ থেকে লেখাপড়া করে আসতে পারি?"

মিঠুন বলল, "সেইটা আমি জানি না। বড় না হওয়া পর্যন্ত তোমার কথা কোনোদিন কেউ শুনবে না।" মিঠুনের মুখটা কেমন যেন শক্ত হয়ে যায় সে মাথা নেড়ে বলল, "মাঝে মাঝে আমার কী মনে হয় জান?"

"কী?"

"মনে হয় যদি একটা টাইম মেশিন তৈরী করে এক ঘণ্টার মাঝে বড় হয়ে যেতে পারতাম।"

ফারা বলল, "কী মেশিন?"

"টাইম মেশিন।"

"সেইটা আবার কী?"

"যে মেশিন দিয়ে সময়ের আগে পিছে যাওয়া যায়।"

"সময়ের আগে পিছে যাওয়া যায়?" ফারা ভুরু কুঁচকে বলল, "সেইটা আবার কীভাবে করবে?"

বগা মুখ শক্ত করে বলল, "অসম্ভব।"

মিঠুন বলল, "তাড়াতাড়ি বড় হওয়া খুবই সম্ভব। আইনস্টাইনের স্পেশাল রিলেটিভিতে পরিষ্কার বলা আছে। টাইম ডাইলেশান বলে একটা

ব্যাপার আছে—”

মিঠুন তখন আরো কিছুক্ষণ বকর বকর করে বৈজ্ঞানিক কথা বলল যার একটা শব্দও আমরা বুঝতে পারলাম না। শুধু টের পেলাম এই ছেলেটা আজব। তাকে বেশী ঘাটানো ঠিক না, ঘাটালেই সে বৈজ্ঞানিক কথা বলে আমাদের মাথা খারাপ করে দেবে। আমি তাই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি ঠিক করেছ কোন ক্লাশ রুমে তুমি বসতে চাও?”

মিঠুন বলল, “তোমরা যেখানে বসবে আজকে আমি সেখানে বসতে চাই।”

ফারা বলল, “ভেরি গুড।”

মিঠুন জানতে চাইল, “কেন? ভেরি গুড কেন?”

“আমাদের ক্লাশে একজনও চশমা পরা ছেলে মেয়ে নাই। এখন একজন হয়েছে।”

মিঠুন মনে হয় ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না, ভুরু কুঁচকে ফারার দিকে তাকাল। ফারা বলল, “ক্লাশে চশমা পরা ছেলেমেয়ে থাকলে ক্লাশের একটা ভাব হয়। সেইজন্যে।”

আমরা যখন হেঁটে হেঁটে মিঠুনকে আমাদের ক্লাশ রুমে নিয়ে যাচ্ছি তখন সে জিজ্ঞেস করল, “তোমরা কোন ক্লাশে পড়?”

“এইট।”

“এইট?” শুনে মনে হল তার একটু মন খারাপ হল, সে ভাবছিল সে অন্য একটা ক্লাশে বসতে পারবে।

আমি বললাম, “মন খারাপ করো না। আমরা তোমাকে অন্য অন্য ক্লাশেও নিয়ে যাব।”

ঝুম্পা জিজ্ঞেস করল, “তুমি এর আগে কোন স্কুলে ছিলে?”

“অক্সব্রীজ। অক্সব্রীজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল।”

আমরা চারজন এক সাথে চিৎকার করে বললাম, “অক্সব্রীজ?”

“হ্যাঁ। কেন? কী হয়েছে?”

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, “না না, কিছু হয় নাই। কিন্তু—”

“কিন্তু কী?”

“তুমি অক্সবীজ থেকে মহব্বতজানে কেন এসেছ?”

“অক্সবীজ থেকে আমাকে টিসি দিয়ে বের করে দিয়েছে।”

“টিসি দিয়ে বের করে দিয়েছে? কেন?”

"সেইটা অনেক লম্বা স্টোরি ।"

ঝুম্পা বলল, "বল তোমার স্টোরি। লম্বা স্টোরি ছোট করে বল ।"

মিঠুন মাথা নাড়ল, "ছোট করে বললে তুমি বুঝবে না ।"

"বুঝব। ঝুম্পা মুখ শক্ত করে বলল, "আমরা অনেক চালু। চোখের ঝিলিক দেখে আমরা মানুষের মুখের কথা বুঝে যাই ।" ঝুম্পা আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তাই না রে?"

আমরা সবাই মাথা নাড়লাম, ঝুম্পার কথা সত্যি, চোখের ঝিলিক দেখে আমরা কথা বুঝে যাই।

মিঠুন বলল, "ঠিক আছে।" তারপর কিছুক্ষণ উপর দিকে তাকিয়ে চিন্তা করল। তারপর নিচের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করল। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলল, তারপর একজন একজন করে সবার মুখের দিকে তাকাল। তারপর আরেকটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমার এক্সপেরিমেন্টের জন্য যখন অক্সব্রীজ স্কুলের সায়েন্স বিল্ডিংটা উড়ে গেল—"

আমরা চিৎকার করে উঠলাম, "কী ? কী বললে?"

বগা বলল, "তুমি সেই রহস্যময় ছেলে?"

ঝুম্পা বলল, "তুমি স্কুল বিল্ডিং উড়িয়ে দিয়েছ?"

ফারা বলল, "কেমন করে উড়িয়েছ?"

আমি বললাম, "আমাদেরটা উড়াবে ? প্লীজ?"

আমরা চারজনই একসাথে চিৎকার করে কথা বলেছি তাই মিঠুন কারো কথাই শুনতে পেল না। সে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ঝুম্পা আমাদেরকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আমরা তোর পুরা লম্বা স্টোরি শুনতে চাই ।"

ঝুম্পা খেয়ালও করল না সে মিঠুন নামের এই নতুন ছেলেটাকে হঠাৎ করে তুই বলে ডাকতে শুরু করেছে। আমাদের সাথে যেহেতু থাকবে আগে হোক আর পরে হোক তুই করে বলতেই হবে, তাই আমরা এখনই শুরু করে দিলাম, বললাম, "হ্যাঁ, তোর পুরা স্টোরি শুনতে চাই। দাড়ি কমা সহ।"

মিঠুন মনে হয় একটু ভ্যাবেচেকা খেয়ে গেল, বলল, "পুরা স্টোরি?"

"হ্যাঁ।"

বগা বলল, "তোকে দেখে বোঝাই যায় না তুই আসলে এরকম ডেঞ্জারাস। আমরা ভেবেছিলাম তুই বুঝি ভ্যাবলা টাইপের ।"

ফারা বলল, "আমি মোটেও ভাবি নাই ভ্যাবলা টাইপের। যে ছেলে

চশমা পরে সে ভ্যাবলা টাইপ হতেই পারে না। তুই অনেক বই পড়িস না?"

"পড়ি। স্যায়েন্সের বই। সায়েন্স আর ম্যাথমেটিক্স।"

ফারা বলল, "দেখেই বুঝেছিলাম তুই জ্ঞানী টাইপ। আমাদের স্কুলেই কোনো জ্ঞানী টাইপ ছাত্রছাত্রী নাই। তুই হবি প্রথম।"

"প্রথম?"

ঝুম্পা বলল, "এবং শেষ।"

মিঠুন ভ্যাবেচেকা খেয়ে সবার দিকে তাকাল। বলল, "শেষ?"

আমরা সবাই মাথা নাড়লাম।

দুই দিন পর মিঠুন আমাদের স্কুলের পেয়ারাগাছের ডালে বসে দাড়ি কমা সহ তার লম্বা স্টোরিটা বলল। (এই পেয়ারাগাছটার মত কপাল খারাপ কোনো পেয়ারাগাছ পৃথিবীতে নাই। এই গাছে কোনো পেয়ারা কখনো বড় হতে পারে নাই– পেয়ারার মত দেখতে হওয়ার আগেই কেউ না কেউ খেয়ে ফেলেছে।) মিঠুন আগে কখনো গাছে ওঠেনি, একটা গল্প বলার জন্যে কেন পেয়ারাগাছে উঠতে হবে সেটাও সে প্রথমে বুঝতে পারেনি। নিচের থেকে ঠেলে এবং উপর থেকে টেনে তাকে পেয়ারাগাছে তুলতে হয়েছে। একবার আরাম করে বসার পর সে অবশ্যি স্বীকার করেছে গল্প বলার জন্যে এই জায়গাটার তুলনা নাই।

মিঠুনের গল্পে অনেক বৈজ্ঞানিক বকর বকর আছে যার কোনোটা আমরা কিছুই বুঝি নাই। বৈজ্ঞানিক বকর বকর বাদ দিলে গল্পটা এরকম :

আমার নাম মিঠুন, ভালো নাম কাজী রকিবুল আলম। আমার বাবার নাম কাজী জাহিদুল আলম। মা নুসরাত জাহান। আমার দাদা কাজী জাহাঙ্গীর, দাদী জোবেদা খানম। আমার নানা—

(এ রকম জায়গায় আমরা মিঠুনকে থামালাম। তার দাদা দাদী নানা নানীর নাম জানলেও আমাদের ক্ষতি নাই। মিঠুন একটু অসন্তুষ্ট হল মনে হল। বলল, "তোমরা না একটু আগে বলেছ দাড়ি কমা সহ বলতে হবে। এখন যখন বলছি তখন বলতে দিচ্ছ না।" আমি বললাম, "দাদা দাদী নানা নানীর নাম, চাচা-চাচী, ফুপা-ফুপু-মামা-মামী কিংবা খালা-খালুর নাম দাড়ি কমার মাঝে পড়ে না। দাড়ি কমা সহ বলার অর্থ হচ্ছে গল্পটি বলার সময়—"

এরকম জায়গায় ঝুম্পা আমাকে ধমক দিয়ে বলল, "ইবু, তুই বকর বকর করবি না। চুপ করে দেখি।" কাজেই আমি চুপ করে গেলাম আর মিঠুন আবার শুরু করল।)

আমার বাসায় আমি ছাড়া আছে আমার আপু। আমার আপু হচ্ছে পারফেক্ট একজন মানুষ। লেখাপড়ায় ভাল, সব সাবজেক্টে জি.পি.এ ফাইভ, গান গাইতে পারে, নাচতে পারে, গলা কাঁপিয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে পারে। ছবি আঁকতে পারে, ডিবেট করতে পারে। এমন কী ভালো ব্যাডমিন্টনও খেলতে পারে। বাসায় যখন কোনো গেস্ট আসে সে তাদের সাথে যতক্ষন দরকার মিষ্টি মিষ্টি করে কথাও বলতে পারে। আমার আব্বু আম্মু আমার বোনকে নিয়ে খুবই খুশী, আমাকে প্রত্যেকদিন কম করে হলেও দশবার করে বলে, "তোর বোন এতো ভালো আর তুই এরকম অপদার্থ বের হলি কেমন করে?"

(এরকম জায়গায় সবাই নিজেদের কথা বলতে শুরু করল, দেখা গেল সবার জীবনে মিঠুনের বড় বোনের মত কেউ একজন আছে যার কারণে তাদের জীবনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে— শুধু আমায় কিছু বলতে হল না কারণ আমার সেরকম কেউ নাই, আমি একা। আমার সাথে আছে আমার বাবা যার আমাকে নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নাই।

সবাই নিজের দুঃখের কথা বলে পরিচিত অন্যান্যদের দুঃখের কথা বলতে শুরু করল তখন আমি ধমক দিয়ে বললাম, "তোরা ঘ্যানঘ্যান করা থামাবি? মিঠুনের কথাটা একটু শুনি।" তখন মিঠুন আবার শুরু করল।)

কথাটা ভুল না যে আমি মোটামুটি অপদার্থ। অংক আর বিজ্ঞান ছাড়া অন্য সব সাবজেক্টে গোল্লা পেতাম। আস্তে আস্তে আমি অংক আর বিজ্ঞানেও গোল্লা পেতে আরম্ভ করলাম তার কারণ পরীক্ষার খাতায় আমি যেটা লেখি সেটা স্যার আর ম্যাডামেরা বুঝতে পারে না। যেমন মনে কর পরীক্ষায় এসেছে অনু পরমানু কীভাবে তৈরী হয়। সবাই লিখেছে পরমানুর ভিতরে থাকে নিউক্লিয়াস বাইরে থাকে ইলেকট্রন এই সব হাবিজাবি। আমি লিখেছি কোয়ার্কের কথা। আপ ডাউন কোয়ার্ক আর তাদের এন্টি পার্টিকেল দিয়ে সবকিছু তৈরী হয়েছে। চার্জ হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল—

(আমরা খুব অস্বস্তির সাথে আবিষ্কার করলাম এরকম জায়গায় মিঠুন তার গল্প বলার বদলে বিজ্ঞান নিয়ে বকর বকর করা শুরু করেছে। আমরা কিছুক্ষণ সহ্য করলাম, একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকালাম তারপর বাধ্য হয়ে ঝুম্পা মিঠুনকে

থামাল। বলল, "মিঠুন, তোর বিজ্ঞানের ভ্যাদর ভ্যাদর শোনার জন্যে আমরা বসি নাই।"

"ভ্যাদর ভ্যাদর?" মিঠুন অবাক হয়ে বলল, "ভ্যাদর ভ্যাদর বলে যে একটা শব্দ আছে সেইটাও আমি জানতাম না।"

ঝুম্পা বলল, "আছে। তুই এখন যেটা করছিস সেটা হচ্ছে ভ্যাদর ভ্যাদর। ভ্যাদর ভ্যাদর ছাড়াও আরো ইন্টারেস্টিং শব্দ আছে, তুই চাইলে তোকে শিখিয়ে দেব। এখন ভ্যাদর ভ্যাদর করা বন্ধ করে তোর গল্পটা বল।"

বিজ্ঞানের কথা বলতে না দেওয়ার জন্যে মিঠুনের মুখটা একটু ভোঁতা হল কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিয়ে লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার শুরু করল)

আমার মনে যে সব প্রশ্ন তৈরি হয় আমি সেটা কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারি না। প্রথম প্রথম কেউ কেউ উত্তর দিতে পারত, আস্তে আস্তে আর কেউ পারে না। তখন আমি বই পড়া শুরু করলাম, বেশীর ভাগ ইংরেজী বই সেগুলো পড়ে পড়ে আমার ইংরেজীটা ভালো হয়ে গেল। পরীক্ষায় ইংরেজীতে ভালো মার্কস পেতে শুরু করলাম। ইন্টারনেটে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতো, বেশীর ভাগ ভুলভাল। তবে দেশে বিদেশে অনেক ইউনিভার্সিটির টিচার আছে ই-মেইলে তাদের কাছে প্রশ্ন করলে তারা উত্তর দিতো। সেইভাবে আমি অনেক কিছু শিখে গেলাম।

একসময় আবিষ্কার করলাম আমাদের ইউনিভার্সের মাত্র চার ভাগ সম্পর্কে আমরা জানি, বাকী ছিয়ানব্বই ভাগ সম্পর্ক আমরা কিছুই জানি না–

(এই কথাটা বলে সে চোখ বড় বড় করে থেমে গেল, সে আশা করছিল এখন তার কথা শুনে আমরাও চোখ কপালে তুলে বলব, "বলিস কী?" "অসম্ভব?" "হতেই পারে না।" কী আশ্চর্য !" কিন্তু আমরা তার কিছুই করলাম না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শতকরা চার ভাগ সম্পর্কে জানলেই কী আর চল্লিশ ভাগ সম্পর্কে জানলেই বা কী? আমাদের কী আসে যায়?

আমাদের দিক থেকে কোনো উৎসাহ না পেয়ে মিঠুন একটু মনমরা হয়ে গেল। মনমরা হয়েই সে আবার বলতে শুরু করে।)

এই ইউনিভার্সের মাত্র চারভাগ পদার্থের কথা আমরা জানি, বাকী ছিয়ানব্বই ভাগ পদার্থ আছে কিন্তু আমরা সেটা কখনো চোখে দেখি নাই।

বৈজ্ঞানিকদের ধারণা সেটা আমাদের চারপাশেই আছে, কিংবা কে জানে আমরা হয়তো সেই পদার্থের ভিতরেই ডুবে আছি কিন্তু সেটা দেখতে পাচ্ছি না।

(মিঠুন আবার একটু থামল, আমরা অবাক হয়ে কিছু একটা বলি কী না– দেখার জন্যে। আমরা কিছু বললাম না, অবাক হওয়ায় জন্যে বিষয়টা বুঝতে হয়। আমরা বুঝি নাই তাই অবাক হই নাই।)

তখন আমার মাথার মাঝে একটা আইডিয়া এল। আমাদের চারপাশে যে অদৃশ্য পদার্থ আছে সেটা কী অন্য কোনোভাবে দেখা সম্ভব ? তোরা সবাই জানিস সাধারণ যে পদার্থ আছে সেগুলো যদি অনেক বেশী হয়ে যায় তাহলে তার নিজের আকর্ষণে সবকিছু ভেঙে চুরে কোনো একসময়ে সেটা ব্ল্যাক হোল হয়ে যায়।

(আমরা কখনো ব্ল্যাক হোল কিংবা হোয়াইট হোল কিংবা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট হোলের কথা শুনি নাই। কিন্তু এখন সেটা প্রকাশ করলাম না। মিঠুনকে খুশী করার জন্যে মাথা নাড়লাম। মাথা নাড়াটা মনে হয় একটু বেশী হয়ে গেল তাই মিঠুন কেমন সন্দেহ করল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, " ইবু কেমন করে ব্ল্যাক হোল তৈরি হয় বল দেখি?"

আমি পড়লাম বিপদে। মাথা চুলকে বললাম, "অ্যাঁ অ্যাঁ ইয়ে, মানে–"

ঝুম্পা আমাকে রক্ষা করল। মিঠুনকে ধমক দিয়ে বলল, "তোর বৈজ্ঞানিক ভ্যাদর ভ্যাদর শুনেই কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে আর এখন তুই পরীক্ষা নেওয়া শুরু করবি? তুই প্রশ্ন করবি আর আমাদের উত্তর দিতে হবে? পাশ ফেল হবে? পেয়েছিসটা কী তুই?"

মিঠুন তখন আরও মনমরা হয়ে গেল। মনমরা হয়ে বলতে শুরু করল)

আমাদের পরিচিত পদার্থ দিয়ে ব্ল্যাক হোল তৈরী করা এতো সোজা না। চাপ দিয়ে যদি পৃথিবীটাকে ব্ল্যাক হোল বানাতে চাই তাহলে পৃথিবীটার সাইজ হবে পিঁপড়ার মতো। কী দিয়ে চাপ দিব? কেমন করে চাপ দিব? কিন্তু বাকী যে ছিয়ানব্বই ভাগ পদার্থ সেটা সম্পর্কে আমরা জানি না। তার সত্তুর ভাগ হয়তো ডার্ক এনার্জী কিন্তু চল্লিশ ভাগ তো অন্যরকম পদার্থ। সেই

অন্যরকম পদার্থ দিয়ে একটা নতুন রকম ব্ল্যাক হোল বানানো সম্ভব? হয়তো তার শোয়ার্ডস চাইল্ড ব্যাসার্ধ হবে অন্য রকম।

(মিঠুন আবার চোখ বড় বড় করে আমাদের দিকে তাকাল, আশা করল আমরা অবাক হয়ে যাব। হতবাক হয়ে যাব। আমরা কিছু বুঝি নাই তাই হতবাক হই নাই। শুধু তাই না বগা তার মাড়ি এবং দাঁত বের করে বিকট ভাবে হাই তুলল। মিঠুন মনমরা ভাবে আবার শুরু করল।)

যেহেতু পৃথিবীর কেউই জানে না এটা কীভাবে করা যায় কেমন করে করা যায় তাই আমি ভাবলাম এইটা পরীক্ষা করে দেখা যাক। প্রথমে হাতুরী দিয়ে এই অদৃশ্য পদার্থকে বাড়ি দিয়ে দেখলাম কিছু করা যায় কী না। কোনো লাভ হল না তখন আমি ইন্টারনেটে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলাম। ইন্টারনেটে অনেক গোপন সাইট আছে, বড় বড় সন্ত্রাসী আর জঙ্গীদের সাইট, আমি হ্যাক করে সেগুলোতে ঢুকে কেমন করে বোমা বানানো যায় সেটা শিখে ফেললাম।

(গল্পের এই জায়গায় আমরা সবাই নড়ে চড়ে বসলাম, বগা পর্যন্ত তার বিশাল একটা হাই গিলে ফেলে চোখ বড় বড় করে তাকাল। আমরা এক সাথে বললাম, "বোমা?" মিঠুন মাথা নেড়ে কথা বলতে শুরু করে।)

বোমা বানানো পানির মত সোজা কিন্তু বোমা বানানোর জন্যে যে মাল মশলা লাগে সেগুলো জোগাড় করা এতো সোজা না। আব্বুর ব্যাংক থেকে সিগনেচার জাল করে টাকা চুরি করা যায় কিন্তু আগে হোক পরে হোক ধরা পড়ে যাব। তখন আমার অক্সব্রীজ স্কুলের কথা মনে পড়ল।

অক্সব্রীজ স্কুল হচ্ছে পুরোপুরি ভূয়া স্কুল। শুধু বড়লোকের ছেলে মেয়েরা এই স্কুলে পড়ে আর তাদের কাছে এতো টাকা বেতন নেয় সেটা শুনলে তোরা অবাক হয়ে যাবি!

(অন্য কেউ লক্ষ করল কী না জানি না আমি লক্ষ করলাম, মিঠুনকে আমরা তুই তুই করে বলছি কিন্তু সে আমাদের তুমি তুমি করে বলছিল। এই প্রথম সেও আমাদের তুই করে বলল।)

অক্সব্রীজ স্কুলের একটা ছেলের এক মাসের বেতন দিয়ে এই দেশের একটা ফেমিলির এক মাসের খরচ চলে যায়। আমি তাই হিসাব করে বের করলাম অক্সব্রীজ স্কুল এখন পর্যন্ত কতো টাকা বানিয়েছে। আমি ঠিক

করলাম সেই টাকা থেকে কিছু টাকা আমার এই বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে খরচ করব।

(আমরা মিঠুনের কথা শুনে খুবই অবাক হলাম। একটা স্কুল কেন তার একজন ছাত্রকে বোমা বানানোর জন্যে টাকা দিবে? মিঠুনকে জিজ্ঞেস করতে হল না, সে নিজেই বলতে শুরু করল।)

অক্সব্রীজ স্কুল তো আমার গবেষণার জন্যে যে বোমা দরকার সেই বোমা বানানোর টাকা দিবে না। টাকাটা আনতে হবে খুবই কায়দা করে। সেটা করার জন্যে আমি প্রথমে সায়েন্স টিচারের সাথে খাতির করলাম। মানুষটা সাদাসিধে হাবাগোবা। বিজ্ঞানের 'ব'ও জানে না। ক্লাশে ভুলভাল যাই পড়ায় আমি জোরে জোরে মাথা নাড়ি। মাঝে মাঝে সোজা সোজা বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলি। আস্তে আস্তে তাকে একটু একটু বিজ্ঞান শিখাই, কঠিন অঙ্কগুলো করে দেই। কোন একটা কনফারেন্সে সে একটা পেপার জমা দিল, সেই পেপারে অনেক ভুলভাল ছিল আমি ঠিক করে দিলাম। কনফারেন্সে সেই পেপার পড়ে তার অনেক নাম হল। তখন তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমি স্কুলের ল্যাবরেটরির একটা চাবি নিয়ে নিলাম। তারপর খোঁজ নিয়ে জানলাম স্কুলে কম্পিউটারের ল্যাব তৈরির করার জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কম্পিউটার, সার্ভার, রাউটার, সুইচ, নেটওয়ার্কিং এসবের যন্ত্রপাতি কিনবে। আমি কম্পিউটার হ্যাক করে পুরা অর্ডারটা পাল্টে দিলাম! অক্সব্রীজ স্কুল জানতেও পারল না কম্পিউটার আর যন্ত্রপাতির অর্ডারের বদলে আমার বোমা বানানোর ক্যামিকেল অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে।

(এরকম জায়গায় আমরা সবাই প্রথমবার চোখ বড় বড় করে মিঠুনের দিকে তাকালাম। চশমা পরা শান্তশিষ্ট চেহারার একটা ছেলের মাথায় এরকম ফিচলে বুদ্ধি?)

আমি বুঝতে পারলাম আমার হাতে সময় খুব কম। বিকেলে বোমা বানানোর জন্যে ফার্টিলাইজার আর ক্যামিকেল ডেলিভারী দিয়েছে। আমি জানি সেই রাতেই যদি এক্সপেরিমেন্ট না করি তাহলে দেরী হয়ে যাবে– আমি ধরা পড়ে যেতে পারি। কাজেই রাতের মাঝে সব ঠিক করে ফেললাম। দুই পাশে বিশাল বিস্ফোরকের স্তূপ। একসাথে ডোটানেট করলে তখন মাঝখানে প্রচণ্ড চাপ তৈরী হবে। চাপটাকে এক বিন্দুতে আনার জন্যে আমি দুইটা ডায়মন্ড ব্যবহার করলাম— ডায়মন্ড সবচেয়ে শক্ত তাই ডায়মন্ড চাপ দেয়ার জন্যে সবচেয়ে ভালো।

(এরকম সময় ফারা মিঠুনকে থামাল, জিজ্ঞেস করল, "ডায়মন্ড মানে কী হীরা?" মিঠুন মাথা নাড়ল, তখন ফারা জানতে চাইল, "হীরা কোথায় পেলি?" মিঠুন মুখ সূঁচালো করে বলল যদি তার মাকে কোনোদিন বলে না দেয় তাহলে সে বলতে পারে। আমরা সবাই মাথা নেড়ে বললাম তার মাকে কখনো বলে দিব না। তখন মিঠুন আমাদেরকে তার ডায়মন্ডের গল্প শোনালো।)

আমার আম্মুর এক জোড়া ডায়মন্ডের কানের দুল আছে। আব্বু সেটা আম্মুকে কিনে দিয়েছে। ডায়মন্ড আর কাচ দেখতে একই রকম। তাই আমি নকল জুয়েলারীর দোকান থেকে এক জোড়া কানের দুল কিনে আনলাম। সেখানে আম্মুর ডায়মন্ডের মতো দেখতে কাচের টুকরো লাগানো। একদিন যখন বাসায় কেউ নাই আমি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুচিয়ে ডায়মন্ড দুইটা খুলে সেখানে কাচের টুকরো দুইটা লাগিয়ে দিলাম। আম্মু কোনোদিন বুঝতে পারেনি– আম্মু ও খুশী আমিও খুশী।

সেই দুইটা ডায়মন্ড দিয়ে আমি একটা প্লাঞ্জার বানালাম। ডায়মন্ড গুলো লাগানো হলো একটা স্টেনলেস পিস্টনের মাথায়। পিস্টনটা লাগালাম দুইটা বড় মেটাল প্লেটে। প্লেটের পিছনে এক্সপ্লোসিভ। দুইটা এক্সপ্লোসিভ একসাথে ডোটানেট করতে হবে সে জন্যে ছোট একটা সার্কিট আগে থেকে তৈরী ...

(মিঠুন তার পুরো যন্ত্রটা বর্ণনা করে গেল। আমরা কিছুই বুঝলাম না কিন্তু সে এতো উৎসাহ নিয়ে হাত পা নেড়ে নেড়ে বলল যে আমরা ধৈর্য্য ধরে শুনে গেলাম। যন্ত্রটার বর্ণনা শেষ করে সে আবার বলতে শুরু করল।)

কতো বড় বিস্ফোরণ হবে আমি জানি না, বিস্ফোরণের পর সবকিছু ওলট পালট হয়ে যাবে, তাই আমি একটা ছোট শিশি রাখলাম ঠিক ডায়মন্ড দুটোর নিচে। যখন ডায়মন্ড দুটো মাঝখানের জায়গাটাকে প্রচণ্ড চাপ দিবে তখন যদি একটা ব্ল্যাকহোল বা ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা তৈরী হয় সেটা এই শিশির মাঝে টুপ করে পড়বে। বিস্ফোরণের পর শিশিটা যেন খুঁজে পাওয়া যায় সেইজন্যে এটার সাথে একটা ছোট ব্যাটারী দিয়ে একটা এল.ই.ডি লাগিয়ে রাখলাম।

তারপর আমি লম্বা তার দিয়ে চলে গেলাম পাশের বিল্ডিংয়ে। ঘড়িতে ঠিক যখন রাত আটটা বাজে তখন সুইচ টিপে দিলাম। সাথে সাথে—

(মিঠুন তখন থেমে গেল, তার মুখে একটা আজব ধরণের হাসি ফুটে উঠল, তারপর দুই হাতে উপরে তুলে চিৎকার করে বলল, বু-ম ।)

সেই শব্দটার মত সুন্দর কোনো শব্দ আমি জীবনেও শুনি নাই । একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা যখন ঠিক করে কাজ করে তখন তার থেকে আনন্দ আর কিছুতে হয় না ।

বিস্ফোরণের পর মিনিটখানেক ধরে ইট পাথর ধূলা বালি পড়তে লাগল । তারপর সবকিছু থেমে গেল । আমি তখন ল্যাবরেটরি ঘরে গেলাম । দেওয়াল ভেঙ্গে গেছে ছাদ উড়ে গেছে । ভিতরে ধোঁয়া ধূলা বালি । কারেন্ট চলে গিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার । আমি তার মাঝে দেখলাম একটা এল.ই.ডি. জ্বলছে । আমার শিশিটা তখনো খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে আছে । আমি হামাগুড়ি দিয়ে কাছে গেলাম, সাবধানে শিশিটা তুলে তার মুখে ছিপিটা লাগালাম তারপর হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে দে দৌড় ।

(এরকম সময়ে ফারা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "আর ডায়মন্ড দুইটা?" মিঠুন বলল, "ঠিক ওপরে ডায়মন্ড দুটি একটা আরেকটার সাথে লেগেছিল সেই দুটিও নিয়ে এসেছি ।" ডায়মন্ড দুটি নিয়ে এসেছে শুনে ফারার বুকের মাঝে মনে হয় এক ধরণের শান্তি হল । মিঠুনকে বলল, "আবার যেদিন তোর বাসায় কেউ থাকবে না সেই দিন তোর আম্মুর কানের দুলে ডায়মন্ড দুটি লাগিয়ে দিস ।" মিঠুন অবাক হয়ে বলল, "কেন?" ফারা আরো অবাক হয়ে বলল, "কেন না?" মিঠুন আরেকটা কিছু বলতে চাচ্ছিল, ঝুম্পা ধমক দিয়ে দুজনকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তারপর কী হল? মিঠুন তখন আবার বলতে শুরু করল ।)

তারপর আমি বাসায় ফিরে এলাম, বাসায় ততক্ষণে জানাজানি হয়ে গেছে সে আমাদের স্কুল উড়ে গেছে । আমার আম্মু আব্বু আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিলেন, আমি বললাম স্কুল উড়ে গেছে শুনে দেখতে গিয়েছিলাম সেজন্যে দেরী হয়েছে । আব্বু আম্মু আমার কথা বিশ্বাস করলেন তখন আর কোনো ঝামেলা হল না ।

আস্তে আস্তে খবর বের হয়ে গেল, সায়েন্স স্যার স্কুলের মালিকদের আমার কথা বলল, আমি যে কম্পিউটার হ্যাক করেছি সেটাও জানাজানি হল । আব্বু আম্মুকে স্কুলে ডেকে নিয়ে গেল, আমার বিরুদ্ধে মামলা করবে

ঠিক করল। কিন্তু আমার বয়স কম, আমার বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না উল্টো স্কুলই ঝামেলায় পড়ে যাবে। তখন স্কুল আমাকে টিসি দিয়ে স্কুল থেকে বের করে দিল। টিসির মাঝে এতো খারাপ খারাপ কথা লিখল যে শহরের আর কোনো স্কুল আমাকে ভর্তি করতে রাজী হল না, তাই শেষ পর্যন্ত মহব্বতজান স্কুলে ভর্তি হয়েছি।

(ঝুম্পা তখন জানতে চাইল টিসিতে কী কী লিখেছিল। মিঠুন হাত নেড়ে প্রথমে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল, চাপাচাপি করার পর বলল "সেখানে লিখেছে, আমি মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ, অপরাধ প্রবণ এবং বিপজ্জনক। আমি সমাজের জন্যে ঝুঁকি এবং আমাকে বাসা থেকে বের হতে দেওয়া ঠিক না।" বগা তখন জানতে চাইল কথাগুলো সঠিক কী না। মিঠুন বলল পুরোপুরি সঠিক না। মিঠুন তখন আবার তার কাহিনী শুরু করল।)

আমি কেন কীভাবে ঘটনাটা ঘটিয়েছি জানার জন্যে পুলিশ র‍্যাব আমার বাসায় গিয়ে আমার জিনিষপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছে কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভ খুলে নিয়ে গেছে। আমার ভয় হচ্ছিল আমার শিশিটা না আবার নিয়ে যায়। সে জন্যে এটা আমি পকেটে রাখি।

(মিঠুন তখন খুব সাবধানে পকেট থেকে সেই বিখ্যাত শিশিটা বের করে আমাদের সামনে ধরে রাখল। আমরা আবার শিশির ভিতরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলাম। আমি ইতস্তত করে বললাম, "মিঠুন, মানলাম তোর এক্সপেরিমেন্ট ঠিক আছে। তুই আস্ত একটা স্কুল ধ্বসিয়ে দিয়েছিস। অক্সব্রীজ স্কুলের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিস। কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারছি না সত্যি সত্যি তুই ব্ল্যাকহোল কিংবা ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা এই শিশির ভিতরে আটকাতে পেরেছিস কী না। আসলে হয়তো ভেতরে কিছুই নাই।" মিঠুন বলল, "আছে!" আমি তখন জানতে চাইলাম সে কীভাবে জানে ভিতরে কিছু আছে। মিঠুন তখন আমার হাতে শিশিটা দিয়ে বলল, "এই দ্যাখ। খুব সাবধান।" আমি হাতে নিলাম আর চমকে উঠলাম। ছোট একটা শিশি কিন্তু শিশিটা বেশ ভারী। শিশিটা নাড়লে ভেতরে কিছু একটা নড়ে। আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু এর ভিতরে আসলেই কিছু একটা আছে। কী আশ্চর্য!)

এটা সত্যিকার ব্ল্যাকহোল না, তাহলে আশেপাশের সবকিছু শুষে

নিত। এটা ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা। আসল ব্ল্যাকহোল কী করে আমি মোটামুটি জানি। কিন্তু এই ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা কী করে আমি জানি না। শুধু আমি না, পৃথিবীর কেউ জানে না। কাজেই এখন আমার এটাকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে।

(মিঠুন তখন অনেক লম্বা নিশ্বাস ফেলল। ঝুম্পা তখন জানতে চাইল কী হয়েছে। মিঠুন বলল, তার বাসা থেকে তার গবেষণার সবকিছু পুলিশ নিয়ে গেছে। যেটুকু বাকী ছিল সেটুকু ফেলে দেয়া হয়েছে। কাজেই তার এখন গবেষণা করার কোনো জায়গা নাই। শুনে আমরা খুব দুশ্চিন্তিত ভঙ্গী করে মাথা নাড়লাম। মিঠুন খুবই মন খারাপ করে আবার শুরু করল।)

আমার কাহিনী এই খানেই শেষ। অনেক লম্বা স্টোরি ছোট করে বললাম। তোরা বিজ্ঞানের কিছু শুনতে চাস না তাই আসল জিনিষগুলি বলতেই পারলাম না। অক্সব্রীজ স্কুল থেকে আমাকে বের করে দিয়েছে সে জন্যে আব্বু আম্মুর খুব মন খারাপ। আপু সকাল বিকাল আমাকে টিটকারী মারে। দেখা হলেই হাত পা নেড়ে বলে:

সোনার চান
মহব্বত জান
নাকে ধরে দাও টান

আমি কোনোমতে সহ্য করি। যদি কোনোভাবে আমার ল্যাবরেটরিটা পেতাম, ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা নিয়ে গবেষণা করতে পারতাম তাহলেই আমার কোনো চিন্তা ছিল না।

(মিঠুন বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার কাহিনী শেষ করল।)

স্কুল থেকে বের হয়েই মিঠুন অবাক হয়ে বলল, "আরে অক্সব্রীজ স্কুলের সায়েন্স স্যার।" আমরা দেখলাম উসখু খুশকু চুল খোঁচা খোঁচা দাড়ি একজন মানুষ আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। মিঠুন অবাক হয়ে বলল, "স্যার আপনি?"

মানুষটি বলল, "হ্যাঁ। আমি। তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"

"আমার জন্যে? কেন?"

"তোমার সাথে একটু কথা ছিল।"

"বলেন স্যার।"

খোঁচা খোঁচা দাড়ি মানুষটা আমাদেরকে দেখিয়ে একটু ইঙ্গিত করে বললেন, "তোমার সাথে একটু নিরিবিলি কথা বলতে চাচ্ছিলাম।"

ঝুম্পা মুখ শক্ত করে বলল, "বলিস না মিঠুন। খবরদার একা একা নিরিবিলি কথা বলবি না। সাক্ষী রেখে কথা বলবি।"

মিঠুনের সায়েন্স স্যার অবাক হয়ে ঝুম্পার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সাক্ষী রেখে কথা বলবে?"

"হ্যাঁ। এখন থেকে মিঠুন আর একা একা কারো সাথে কথা বলবে না।"

মিঠুন মাথা নাড়ল, বলল, "জী স্যার। এরা সবাই আমার বন্ধু। আপনি এদের সামনে কথা বলতে পারেন।"

সায়েন্স স্যার বললেন, "কিন্তু কথাগুলো খুব সেনসিটিভ।"

মিঠুন বলল, "সমস্যা নাই। আমার এই বন্ধুরাও খুব সেনসিটিভ।"

আমরা জোরে জোরে মাথা নাড়লাম আর সায়েন্স স্যার কেমন যেন ঘাবড়ে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন, "ইয়ে মানে, আমি আমাদের স্কুলের সেই এক্সপ্লোশানটার ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।"

"বলেন।"

"স্কুলটা খোলার জন্যে ডিসিশন নেয়া হয়েছে। কিন্তু পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দিচ্ছে না। বলছে–" স্যার থেমে গিয়ে এদিক সেদিক তাকালেন।

"কী বলছে?"

"মানে ইয়ে একপ্লোশনে যে এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করা হয়েছে সেটার মাঝে ইন্টারন্যাশনাল টেরিস্টদের এক্সপ্লোসিভের একটা মিল আছে। তারা সন্দেহ করছে–"

"কী সন্দেহ করছে?"

"না মানে ইয়ে বলছিলাম কী—" সায়েন্স স্যার ইতস্তত করে বললেন, "আমরা সবকিছু বলেছি, কিন্তু পুলিশ বিশ্বাস করতে চাইছে না। বলছে ক্লাশ এইটে পড়ে একটা ছেলের পক্ষে এটা করা সম্ভব না। নিশ্চয়ই কোনো বড় মানুষ আছে।"

ঝুম্পা বলল, "মিঠুন তুই কোনো কথা বলবি না। খালি শুনে যা।"

আমরাও জোরে জোরে মাথা নাড়লাম, "শুনে যা। খালি শুনে যা।"

স্যায়েন্স স্যার মনে হয় আরো একটু ঘাবড়ে গেলেন, বললেন, "তুমি যদি পুলিশকে একটু বুঝিয়ে বল কেমন করে করেছ। বিশেষ করে কেন করেছ–"

ঝুম্পা আবার গম্ভীর গলায় বলল, "খবরদার মিঠুন, তুই একটা কথাও বলবি না। একটা কথাও না।"

স্যার বলল, "ঠিক আছে পুলিশকে বলতে হবে না। খালি আমাকে বল কেন করেছ। কী উদ্দেশ্য– আমি চিন্তা করে পাই না।"

ঝুম্পা বলল, "বলবি না।"

স্যার বলল, "আমি কথা দিচ্ছি কাউকে বলব না। কাউকে না"।

ঝুম্পা বলল, "খবরদার মিঠুন তুই একটা কথা বলবি না। তুই এখন আর অক্সব্রীজ স্কুলে পড়িস না। এখন তুই আমাদের স্কুলে পড়িস। (ঝুম্পা আমাদের কথাটা বলার সময় বুকে একটা থাবা দিল) তোর ভালো মন্দ দেখার দায়িত্ব এখন আমাদের (আবার বুকে থাবা)। আমাদের পারমিশান ছাড়া তুই যদি একটা কথা বলিস আমরা তোর ঠ্যাঙ ভেঙ্গে দিব (হাত মুঠি করে ঘুষি দেওয়ার ভঙ্গি)।"

মিঠুন তার সায়েন্স স্যারের দিকে তাকিয়ে কোনো কথা না বলে একবার ঘাড় ঝাঁকুনী দিল। সায়েন্স স্যার তখন দাঁড়িয়ে পড়লেন, আমরা হেঁটে হেঁটে চলে এলাম।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একজন একজন করে সবাই নিজেদের বাসার দিকে চলে গেল, থেকে গেলাম শুধু আমি আর মিঠুন। আমি মিঠুনকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোর বাসা কোথায়?"

"ঐ তো কাজী বাড়ীতে।"

"কাজী বাড়ী তো পিছনে ফেলে এলাম।"

"জানি। এতো তাড়াতাড়ি বাসায় গিয়ে কী করব তাই তোর সাথে একটু হাঁটি।"

"আমার বাসায় যাবি?"

"বাসার লোকজন বিরক্ত হবে না তো? বড় মানুষেরা ছোটদের দেখলে খুব বিরক্ত হয়।"

"না হবে না। আমার বাসায় কোনো লোক টোক নাই।"

"কোনো লোক নাই?"

"না। খালি আমার বাবা আর আমি।"

"তোর মা?"

"মরে টরে গেছে মনে হয়। বাবা কিছু বলে না, আমিও কিছু জিজ্ঞেস করি না।"

কথাটা সত্যি না। আসলে আমি যখন ছোট তখন আমার মা বাবাকে ছেড়ে অন্য একজনকে বিয়ে করে চলে গেছে। সেই কথাটা বলতে লজ্জা করে দেখে কাউকে বলি না।

মিঠুন তার ঠোঁট সূঁচালো করে শীষ দেওয়ার চেষ্টা করল, শীষের শব্দ না হয়ে বাতাস বের হওয়ার একটা শব্দ হল। বলল, "তোর বাবা কী করে?"

"কিছু করে টরে না।"

"তাহলে?"

"তাহলে কী?"

"তোদের চলে কেমন করে?"

"চলে টলে না।"

মিঠুন খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হি হি করে হাসতে শুরু করল। হাসতে হাসতে বলল, "তোর কী মজা।"

মিঠুনের এই কথাটা অবশ্যি সত্যি। আমার বয়সী অন্য যে কোনো ছেলের থেকে আমার জীবন বেশী মজার। বাবা একটু আধপাগলা ধরণের মানুষ, আমার মনে হয় মা সেজন্যেই বাবাকে ছেড়ে চলে গেছে। শহরে

আমাদের একটা দোতলা বাসা আছে নিচের তালাটা ভাড়া দেওয়া আছে, দোতালায় আমরা থাকি। ভাড়ার টাকা দিয়ে আমাদের টেনে টুনে দিন চলে যায়। মাঝে মাঝে বাবা টাকা কামাই করার জন্যে কিছু একটা করার চেষ্টা করে, তখন টাকা পয়সা নষ্ট হয়, টাকা পয়সার টানাটানি হয়। বাবা আমাকে কিছুই বলে না আমি যেটা ইচ্ছা হয় করি। আমিও বাবাকে কিছু বলি না বাবার যেটা ইচ্ছা হয় করে।

মিঠুনকে নিয়ে দোতালায় এসে দেখলাম দরজা খোলা, তার মানে বাবা বাসায়।

বাবা বাইরের ঘরে সোফায় আধাশোয়া হয়ে টেলিভিশনে ক্রিকেট খেলা দেখছিল। আমাকে দেখে বলল, "দশ বলে ষোল রান দরকার, হেরে যাবে মনে হয়।"

কার সাথে কার খেলা, দশ বলে ষোল রান না হলে কেন হেরে যাবে আমি বুঝতে পারলাম না বোঝার চেষ্টাও করলাম না। আমার সাথে যে মিঠুন একটা নূতন ছেলে এসেছে মনে হয় বাবা সেটা লক্ষও করেনি। আমি বললাম, "বাবা এই যে মিঠুন। আমাদের ক্লাশে পড়ে।"

বাবা টেলিভিশন থেকে চোখ না তুলে বলল, "নো বল হয়েছে। দশ বলে, পনেরো রান।"

আমি মিঠুনকে বললাম, "আয় উপরে যাই।"

মিঠুন বলল, "চল।"

আমাদের বাসার মাঝে ছাদটা একটু খোলামেলা, আমার কিছু করার না থাকলে ছাদে এসে শুয়ে থাকি। দিনের বেলা মেঘ আর রাত্রে তারা দেখি। ছাদে একটা চিলেকোঠা আছে, এই ঘরটা আমার নিজস্ব। মেঝেতে একটা মাদুর বিছানো আছে। পাশে একটা পুরানো শেলফে কিছু গল্পের বই। দেওয়ালে ছবি, রং দিয়ে সরাসরি দেওয়ালে আঁকা হয়েছে। ঘরটি আমার নিজস্ব– তাই বাইরের কেউ আসে না, এলে দেওয়ালের ছবি দেখে নিশ্চয়ই ভয় পেতো। প্রথম ছবিটি একজন মানুষের, সে বুক কেটে তার হৃৎপিণ্ডটি টেনে বের করে আনছে, মানুষটার মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন, হাতে পায়ে রক্ত। দ্বিতীয় ছবিটা একটা পিশাচের, থমথমে মুখ শুধু চোখ দুটি ভয়ংকর। ঠোঁটের পাশ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। তৃতীয় ছবিটা একজন মানুষের, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে, জিবটা বের হয়ে আছে।

মিঠুন ছবিগুলো দেখে ভয় পেলো না, চমৎকৃত হল। বলল, "তুই খুব

ভালো আঁকিস। তার থেকে ইম্পারট্যান্ট কী জানিস?"

"কী"?

"তোর আইডিয়াগুলো ভালো। এরকম আইডিয়া আমি দেখি নাই।"

আমি বললাম, "তোকে এখানে এনেছি কেন জানিস?"

"কেন?"

"কেন?"

"এটা আমার ঘর। তোকে এই ঘরটা দেখাতে এনেছি।"

"দেখলাম।"

"এই ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ আসে না।"

মিঠুন দেওয়ালের ছবিগুলো দেখিয়ে বলল, "কেউ আসলেও ভয়ে পালাবে।"

আমি বললাম, "তোর এই ঘরটা পছন্দ হয়?"

"হবে না কেন?"

"তোকে আমি এই ঘরটা দিয়ে দিলাম। তুই ইচ্ছা করলে এইখানে তোর ল্যাবরেটরি বানাতে পারিস।"

মিঠুন জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকাল। বলল, "সত্যি"?

"সত্যি?"

"আমার ল্যাবরেটরি?"

"হ্যাঁ। তোর ল্যাবরেটরি।"

"কেউ কিছু বলবে না? টান দিয়ে যন্ত্রপাতি, ক্যামিকেল নালায় ফেলে দিবে না?"

"না।"

মিঠুনের তখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, মাথা নেড়ে বলল, "আমার নিজের ল্যাবরেটরি?"

"হ্যাঁ। তোর নিজের ল্যাবরেটরি।"

মিঠুনকে আমরা কয়েকদিন হল দেখছি, চোখে চশমা মাথায় এলোমেলো চুল গম্ভীর মুখ দেখে কেমন যেন বড় মানুষের মতো মনে হয়। আমাদের চিলেকোঠায় সে তার ল্যাবরেটরি বসাতে পারবে শুনে প্রথমবার তার মুখে সত্যিকারের একটা হাসি ফুটে উঠল আর তাকে একটা বাচ্চা ছেলের মতো দেখাতে লাগল। মিঠুন ঘরটার ভিতরে কয়েকবার হেঁটে তার পকেট থেকে শিশিটা বের করে বলল, "আমি তাহলে ব্ল্যাক হোলের বাচ্চা

এই খানে রেখে যাই?"

"রেখে যা।"

"কেউ নিবে না তো?"

"না কেউ নিবে না। এটা একটা নেওয়ার মত জিনিষ না।"

মিঠুন গম্ভীর মুখে বলল, "শিশিটা পড়ে ভেঙে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

"ঠিক আছে আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" বলে আমি আমার ছোট একটা বাক্স এনে শিশিটাকে কাপড়ে জড়িয়ে বাক্সের ভিতরে রেখে দিলাম, বললাম। এখন এটা পড়ে ভেঙ্গে যাবে না।"

পরদিন ক্লাশে বসে মিঠুন তার খাতায় আঁকিবুকি করতে করতে বিড় বিড় করে নিজের সাথে কথা বলতে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, " তোর কী হয়েছে? কার সাথে কথা বলছিস?"

মিঠুন বলল, "কারো সাথে না। ব্ল্যাকহোলের বাচ্চাটা কীভাবে টেস্ট করব ঠিক করছি।"

"কীভাবে করবি?"

"জিনিষটার ভর বের করতে হবে। তাপমাত্রা, তাপ পরিবহন, রেজিস্ট্যান্স এগুলো সব বের করতে হবে। কেমন করে বের করা যায় তাই দেখছি।"

"কেমন করে বের করবি?"

"এখনো জানি না, কিছু যন্ত্রপাতি লাগবে।"

"যন্ত্রপাতি কোথায় পাবি?"

মিঠুন মাথা চুলকালো, "এখনো জানি না। কিনতে হবে।"

এটা ছিল বিজ্ঞান ক্লাশ আর এরকম সময় বিজ্ঞান স্যার ক্লাশে ঢুকলেন। স্যারের নাম আক্কাস আলী, আমরা ডাকি কালা পাহাড়— কারণ আক্কাস আলী কালো এবং পাহাড়ের মত বড়। স্যার ক্লাশে এসে সাধারণত একটু কষ্ট করে চেয়ারের দুই হাতলের ফাঁক দিয়ে নিজের শরীরটা ঢুকিয়ে বসে পড়েন। তারপর মুখ হা করে ঘুমিয়ে যান, বিচিত্র শব্দ করে তার নাক ডাকতে থাকে।

আজকে কী হল কে জানে কাল পাহাড় স্যার, একটা বেত নিয়ে ক্লাশে

ঢুকলেন আর কষ্ট করে চেয়ারে ঢুকে না গিয়ে ক্লাশের সামনে দাঁড়িয়ে নানারকম শব্দ করে হুংকার দিতে লাগলেন। দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, "তোরা সবাই লেখা পড়া করিস তো?"

আমরা মাথা নাড়লাম। স্যার হাতের বেত দিয়ে টেবিলে চটাশ করে মেরে বললেন, "আর লেখাপড়া করবি কেমন করে? কী পড়বি? বইয়ের মাঝে সব ভুলভাল লেখা।"

বইয়ের মাঝে ভুলভাল কী লেখা আমার জানার ইচ্ছে করছিল কিন্তু জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। তখন কালা পাহাড় স্যার নিজেই বললেন, "তোদের বইয়ে লেখা ভারী আর হালকা জিনিষ ছেড়ে দিলে নাকী দুইটা একসাথে নিচে পড়বে। এটা কখনো সম্ভব?"

আমরা চুপ করে রইলাম শুধু মিঠুন মিহি গলায় বলল, "সম্ভব।"

কপাল ভালো কালাপাহাড় স্যার মিঠুনের কথা শুনতে পেলেন না। আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। স্যার বললেন, "ভারী জিনিষ আগে পড়ে হালকা জিনিষ পড়ে পরে। দুনিয়ার সবাই এই কথা জানে। আর বইয়ে পুরা উল্টা কথা লেখা। তাজ্জবের ব্যাপার।"

মিঠুন চিকন গলায় বলল, "একসাথে পড়ে।"

কালাপাহাড় স্যার এবার মিঠুনের কথা শুনে ফেললেন, চমকে উঠে বললেন, "কে? কে কথা বলে?"

মিঠুন বলল, "আমি স্যার।"

স্যার এবারে প্রথম মিঠুনকে দেখতে পেলেন, তারপর বাঘ যেভাবে হরিণকে ধরে কিংবা বিড়াল যেভাবে ইঁদুরকে ধরে কিংবা টিকটিকি যেভাবে পোকাকে ধরে ঠিক সেইভাবে মিঠুনের দিকে এগিয়ে এলেন, বললেন, "তুই কী বলেছিস?"

"আমি বলেছি ভারী জিনিষ আর হালকা জিনিষ এক সাথে পড়ে।"

স্যার শূন্যে শপাং করে বেতটা মেরে হুংকার দিলেন, "কোনদিন দেখেছিস একসাথে পড়তে?"

"বাতাসের বাধা—"

"ফালতু কথা। বাতাসের আবার বাধা কী?" স্যার হুংকার দিলেন, "বেরিয়ে আয় আজকে তোকে বেতিয়ে সিধে করে দেব। বাতাসের বাধা বের করে ছাড়ব।"

মিঠুন কোনো কথা বলল না, কাঠ হয়ে বসে রইল।

"বের হয়ে আয় বলছি, আজ তোকে দেখাচ্ছি মজা ।"

মিঠুন ঢোক গিলে আমার দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলল, "মারবে নাকী আমাকে?"

"হ্যাঁ ।"

"ব্যথা লাগবে?"

"হ্যাঁ ।"

"বেশী?"

"শরীরটা শক্ত করে রাখিস না । ঢিলে ঢালা করে রাখিস তাহলে ব্যথা একটু কম লাগবে ।"

কালাপাহাড় স্যার আবার হুংকার দিলেন, "বের হয়ে আয় ।"

মিঠুন বের হয়ে এগিয়ে গেল, স্যার মিঠুনকে মারার আগে বেতটা বাতাসে শপাং করে মেরে একবার প্র্যাকটিস করে নিলেন, তারপর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে এগিয়ে গেলেন, মিঠুন দুই হাত উপরে তুলে বলল, "স্যার, স্যার একটা কথা ।"

"কী কথা?"

"আমি যদি আপনাকে দেখাই ভারী আর হালকা জিনিষ এক সাথে পড়ে তাহলে কী—"

"আমাকে দেখাবি?"

"জী স্যার ।"

"দেখা ।"

মিঠুন মাথা চুলকাল, বলল, "একটু সময় লাগবে স্যার ।"

কালাপাহাড় স্যার ভুরু কুঁচকে বললেন, "সময় লাগবে?"

"জী স্যার ।"

"কতোক্ষণ?"

"কয়েকদিন"

কয়েকদিন শুনে স্যার আবার বেত তুললেন, বাতাস শপাং করে মেরে আরেকবার প্র্যাকটিস করলেন তারপর এগিয়ে এলেন । মিঠুন বলল, "স্যার, স্যার, স্যার—"

"কী হল?"

"কয়েকদিন সময় আর স্কুলের ল্যাবরেটরি রুমটা লাগবে তাহলে আপনাকে পরীক্ষা করে দেখাতে পারব স্যার ।"

আমরা মিঠুনের সাহস দেখে অবাক হলাম, কালাপাহাড় স্যার মনে হয় আরো বেশী অবাক হলেন। মিঠুনের দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ করে তার মনে হতে লাগল যে তাকে আগে কোনোদিন দেখেননি। জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কে? কোত্থেকে এসেছিস?"

"আমার নাম মিঠুন স্যার, আমি স্যার নূতন এসেছি।"

"আগে কোন স্কুলে ছিলি?"

"অক্সব্রীজ।"

কালাপাহাড় স্যার এবারে চমকে উঠেলেন, "অক্সব্রীজ?"

"জী স্যার।"

স্যার কিছুক্ষণ মিঠুনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "অক্সব্রীজ ছেড়ে এই স্কুলে কেন?"

মিঠুন চুপ করে রইল।

কালাপাহাড় স্যার আবার হুংকার দিলেন, "কেন?"

"আমাকে বের করে দিয়েছে।"

"কেন?"

"ল্যাবরেটরি ক্লাশে একটা গোলমাল হয়েছিল।"

"সেইজন্যে বের করে দিল? কী রকম স্কুল এইটা?

মিঠুন বলল, "খুবই ফালতু স্কুল স্যার।"

কালাপাহাড় স্যারের মনে হল এই উত্তরটা খুবই পছন্দ হল, স্যার দুলে দুলে হে হে করে হাসলেন। বললেন, "ফালতু স্কুল?"

"জী স্যার।"

"কেন?"

আমরা দেখলাম মিঠুন তার মাথা চুলকাচ্ছে, মনে হয় ভালো একটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছে। খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "চিন্তার স্বাধীনতা নাই।"

"চিন্তার স্বাধীনতা? সেইটা আবার কী জিনিষ?"

"যেমন মনে করেন স্যার বইয়ে লেখা আছে ভারী আর হালকা জিনিষ এক সাথে পড়ে। কিন্তু আমরা স্যার এই ক্লাশে আলোচনা করছি যে ভারী আর হালকা জিনিষ একসাথে পড়ে না। ভারী জিনিষটা আগে পড়ে। এইযে স্যার এইটা হচ্ছে চিন্তার স্বাধীনতা। যেটা সত্যি না সেইটাও আলোচনা করা যায়।"

কালাপাহাড় স্যার আবার গরম হয়ে উঠলেন, বললেন, "কে বলেছে

এটা সত্যি না?"

মিঠুনটা কতো বড় গাধা, চুপচাপ থাকলেই বেঁচে যায়, কিন্তু চুপচাপ থাকল না, বলল, "স্যার আমি বলেছি।"

কালাপাহাড় স্যার চোখ লাল করে তাকালেন, কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, মিঠুন তার আগেই বলল, "স্যার আপনি বলেছেন এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাতে।"

"আমি বলেছি?"

"জী স্যার। আমি দেখাব।"

"আর যদি দেখাতে না পারিস?"

"পারব স্যার।" মিঠুন আমতা আমতা করে বলল, "শুধু–"

"শুধু কী?"

"শুধু ল্যাবরেটরি ক্লাশটা যদি আমাদের ব্যবহার করতে দেন।"

"ল্যাবরেটরি ক্লাশ?"

মিঠুন মাথা নাড়ল, বলল, "জী স্যার। সব সময় তালা মারা থাকে। আমি খোঁজ নিয়েছিলাম অফিস থেকে বলেছে চাবি নাকী হারিয়ে গেছে।"

কালাপাহাড় স্যার মুখ শক্ত করে বললেন, "মোটেও চাবি হারায় নাই। আমার কাছে আছে।"

"তাহলে স্যার আমাদেরকে যদি দেন তাহলে আমরা ল্যাবরেটরিটা পরিষ্কার করে ফেলব। জানালা দিয়ে দেখেছি স্যার ভিতরে অনেক ময়লা। মাকড়শার জাল। কবুতরের বাসা। পরিষ্কার করে স্যার আপনাকে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাব যে ভারী আর হালকা জিনিষ এক সাথে পড়ে।"

আমরা ভেবেছিলাম কালাপাহাড় স্যার প্রচণ্ড রেগে মিঠুনকে পেটাতে শুরু করবেন, কিন্তু স্যার কিছুই করলেন না, খানিকক্ষণ মিঠুনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তুই বলছিস অক্সব্রীজ খুবই ফালতু স্কুল?"

"জী স্যার। আমি ঐ স্কুলে ছিলাম স্যার। আমি জানি।"

"আমরা আরো ভাবতাম খুব বুঝি ভালো স্কুল।"

আমরা দেখলাম মিঠুন মিচকে শয়তানের মত বলল, "না স্যার খুবই ফালতু স্কুল।"

মহব্বত জান স্কুলের ছাত্ররা আমরা যেরকম অক্সব্রীজ স্কুলকে হিংসা করি, আমাদের স্যারেরাও হিংসা করেন। তাই দেখলাম কালাপাহাড় স্যার দুলে দুলে হাসলেন, বললেন,"ফালতু স্কুল। হে হে হে!"

মিঠুন বলল, "তাহলে স্যার ল্যাবরেটরি রুমের চাবিটা?"

আমরা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না যখন শুনলাম কালাপাহাড় স্যার বললেন, "ঠিক আছে ঠিক আছে নিস। কিছু ভাংবি না তো?"

মিঠুন জোরে জোরে মাথা নাড়ল, "না স্যার ভাংব না।"

"চুরি করবি না তো?"

"না স্যার চুরি করব না।"

আমাদের স্কুলে যে একটা ল্যাবরেটরি ক্লাশ আছে আমরা সেটা জানতাম না, মিঠুন ঠিকই এটা আবিষ্কার করেছে– তবে এর তালা কোনোদিন খোলা হয়নি। কালাপাহাড় স্যারের কাছ থেকে চাবি নিয়েও কোনো লাভ হল না, তালাটা ভেতরে এমনভাবে জং ধরেছে যে চাবিটা ঘোরানোই গেল না। আমরা হাল ছেড়েই দিচ্ছিলাম, কিন্তু মিঠুন হাল ছাড়ল না। বোতলে করে কেরোসিন তেল নিয়ে এসে তালাটাকে চুবিয়ে রাখল— তারপর চাবিটা নড়াচাড়া করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত তালাটা আমরা খুলতে পারলাম।

দরজাটা ধাক্কা দেবার পর সেটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল, আমরা আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকলাম। ভেতরে আবছা অন্ধকার— তার মাঝে কয়েকটা পাখী কিংবা বাদুর ডানা ঝাপটিয়ে উড়তে লাগল। মাঝখানে কয়েকটা টেবিল, সেই টেবিলের ওপর ধূলার স্তর। দেয়ালের সাথে লাগানো কয়েকটা আলমারী, তার উপরে এতো পুরু হয়ে ধূলা জমেছে যে ভিতরে কি আছে দেখাই যাচ্ছে না।

ল্যাবরেটরি ঘরের এক কোনায় কিছু একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা। ফারা সেখানে উঁকি দিয়ে ভয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে এল। ঝুম্পা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

ফারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "ভূত।"

ঝুম্পার পিছু পিছু আমরাও ভূত দেখতে গেলাম, কাছে গিয়ে কাপড়টা তুলে দেখা গেল এটা নর কংকাল ঝুলছে। দেখে আমরাও ভয় পেয়ে চিৎকার করতে যাচ্ছিলাম। ভূত না হোক কাউকে নিশ্চয়ই মার্ডার করে এখানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। তখন মিঠুন বলল, "এইটা বায়োলজি ক্লাশের জন্যে।"

ফারা জানতে চাইল, "ভূত না?"

"না।"

বগা বলল, "আসল কংকাল। তাই এইটার ভূত তো আসতেও পারে।"

মিঠুন বলল, "আসলে ভালো, আমরা বোতলে ভরে ফেলব।"

মিঠুন কংকালটাকে দেখে টেখে বলল, "এইটা মেয়ের কংকাল।"

ঝুম্পা ভুরু কুঁচকে বলল, "তুই কেমন করে জানিস?"

অক্সব্রীজ স্কুলে একটা ছিল তখন স্যার আমাদের শিখিয়েছিলেন। "এই যে দেখ–" বলে মিঠুন কংকাল দেখে কেমন করে ছেলে আর মেয়ে বোঝা যায় সেটা বোঝানো শুরু করল।

আমরা কিছুক্ষণ ধূলায় ঢাকা ল্যাবরেটরিতে ঘুরে বেড়ালাম। ভেতরে অনেক ইঁদুর আছে সেগুলো আমাদের দেখে মনে হয় খুব বিরক্ত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করল। ইঁদুর ছাড়াও ড্রয়ারের ভেতর রয়েছে তেলাপোকা আর পুরো ল্যাবরেটরিতে মাকড়শার জাল।

আমি মিঠুনকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুই কালাপাহাড় স্যারকে কেমন করে দেখাবি ভারী জিনিষ আর হালকা জিনিষ এক সাথে পড়ে? এক্সপেরিমেন্ট কীভাবে করবি? এই ল্যাবরেটরিতে তো খালি ধূলা আর ইঁদুর!"

মিঠুন হাসল, বলল "এক্সপেরিমেন্ট করার জন্যে কিছু লাগবে না। আমি ইচ্ছে করলে ক্লাশেই দেখাতে পারতাম।"

"তাহলে?"

"মার থেকে বাঁচার জন্যে বলছিলাম। তাছাড়া–"

"তাছাড়া কী?"

"আস্ত একটা ল্যাবরেটরি এখানে পড়ে আছে। এইখানে নিশ্চয়ই অনেক কিছু আছে। ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা পরীক্ষা করার সময় কাজে লাগবে।"

ধূলায় ঢাকা এই ঘরটা পরিষ্কার করার আমাদের কোনো ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মিঠুনের উৎসাহের কারণে স্কুলের ঝাড়ুদারকে ডাকিয়ে আমরা সত্যি সত্যি এটাকে পরিষ্কার করে ফেললাম। মিঠুনের কথা সত্যি, ল্যাবরেটরির ভেতরে অনেক কিছু আছে, মহব্বতজান স্কুলের স্যার ম্যাডামেরা কেন কোনোদিন আমাদের সেগুলো ব্যবহার করতে দেন নাই কে জানে! ল্যাবরেটরির জিনিষগুলো দেখে আমাদের সেরকম কিছু হল না— কিন্তু মিঠুন উৎসাহে টগবগ করতে লাগল। আমাকে গলা নামিয়ে বলল, "অক্সব্রীজ স্কুলে তো আমি খালি ব্ল্যাক হোলের বাচ্চা বানিয়েছিলাম, এখানে দেখিস

আমি সত্যি সত্যি ব্ল্যাক হোল বানিয়ে ফেলব।"

ঠিক এরকম সময় কালাপাহাড় স্যার ল্যাবরেটরিতে ঢুকলেন, পরিষ্কার ল্যাবরেটরিটা দেখে স্যার নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেলেন কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করলেন না। ভুরু কুঁচকে এদিক সেদিক তাকালেন তারপর মিঠুনের দিকে তাকালেন। বললেন, "দেখি তোর এক্সপেরিমেন্ট, ভারী জিনিষ আর হালকা জিনিষ নাকী একসাথে পড়ে। দেখা-"

মিঠুন মাথা চুলকে বলল, "স্যার সত্যি সত্যি দেখাতে হলে একটা পাম্প লাগবে এখানে তো পাম্প নাই-"

"আমি আগেই বলেছিলাম, কেউ এটা দেখাতে পারবে না।"

"অন্যভাবে দেখাব স্যার?"

কালাপাহাড় স্যার নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে খানিকটা বাতাস বের করলেন, বললেন, "দেখা, ঠিক করে না দেখালে পিটিয়ে তোর ছাল তুলে ফেলব।"

মিঠুন পকেট থেকে একটা এক টাকার কয়েন বের করল তারপর খাতা থেকে কয়েনের সাইজের ছোট একটা কাগজ ছিঁড়ে বলল, "স্যার, এমনি যদি ছাড়ি তাহলে কয়েনটা আগে পড়বে কাগজটা পরে। এই যে স্যার—"

মিঠুন একসাথে কয়েন আর কাগজটা ছেড়ে দিল। কয়েনটা টুং শব্দ করে নিচে পড়ল কাগজটা ভাসতে ভাসতে নিচে পড়ল। মিঠুন তখন কয়েন আর কাগজটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, "এইবার আবার ফেলব। কিন্তু স্যার কাগজটাকে মুচড়ে ছোট করে নেব—" বলে মিঠুন কাগজের টুকরাটাকে কুঁচকে মুচকে পিষে ছোট একটা গুটলি করে নিল। বলল, "আগের কাগজটাই আছে কিন্তু এখন সাইজ খুব ছোট। এখন স্যার কয়েন আর কাগজের গুটলিটা ফেলি, দেখবেন এক সাথে পড়বে।"

মিঠুন কয়েন আর কাগজের গুটলিটা একসাথে ফেলল আর সত্যি সত্যি এক সাথে দুটো নিচে পড়ল। মিঠুন বলল, "দেখলেন স্যার?"

কালাপাহাড় স্যার চোখ পাকিয়ে বললেন, "আমার সাথে রংবাজি? এইটা প্রমাণ হল? কাগজটাকে গুটলি করবি কেন? কাগজটাকে কাগজের মত করে আমাকে দেখা—"

মিঠুন মাথা চুলকালো তারপর বলল, "ঠিক আছে স্যার। তারপর খাতা থেকে ছোট একটা কাগজ ছিঁড়ে কয়েনটার ওপরে রাখল। বলল, "স্যার এই যে কাগজটা কয়েনের ওপর রেখেছি। আঠা দিয়ে লাগানো নাই স্যার শুধু

উপরে রাখা আছে।"

কালাপাহাড় স্যার ভুরু কুঁচকে তাকালেন, বললেন, "তাতে কী হল?"

"এখন স্যার এই কয়েনটা ছেড়ে দিব। যদি ভারী জিনিষ আগে পড়ার কথা তাহলে কয়েনটা আগে পড়বে কাগজটা পরে। কিন্তু দেখেন—"

মিঠুন কয়েনটা ছাড়ল সেটা নিচে পড়ল, কয়েনটার ঘাড়ে চেপে কাগজের টুকরাটা একই সাথে নিচে পড়ল। দেখে মনে হল কাগজটা বুঝি আঠা দিয়ে কয়েনের গায়ে লাগানো। মিঠুন বলল, "কাগজটা কয়েনের সাথে পড়েছে তার কারণ কয়েন এটাকে বাতাসের ঘর্ষণ দেখতে দেয়নি— কয়েনটা বাতাসের পুরো ঘর্ষণটুকু সহ্য করেছে।"

কালাপাহাড় স্যার হুংকার দিলেন, "তোর মুণ্ডু। খালি দুই নম্বুরী কাজ কাম। আলাদা করে ফেলে দেখা। যদি না পারিস তাহলে তোর একদিন কী আমার একদিন। অক্কুব্রীজ স্কুলের যত অপদার্থ সব এই স্কুলে জায়গা নিবি? ফাজলেমী পেয়েছিস?"

মিঠুন শুকনো মুখে বলল, "স্যার আলাদা করে ফেলে দেখাতে হলে একটা পাম্প লাগবে স্যার।"

"এখন লাট সাহেবের জন্যে পাম্প কিনতে হবে? আর কী কিনতে হবে? রকেট ইঞ্জিন?"

মিঠুন বলল, "স্যার আপনাকে একটা জিনিষ জিজ্ঞেস করব স্যার?"

"আমাকে?"

"জী স্যার।"

কালাপাহাড় স্যার সন্দেহের চোখে মিঠুনের দিকে তাকালেন তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "ঠিক আছে। জিজ্ঞেস কর।"

"স্যার আপনি বলেছেন একটা হালকা জিনিষ আস্তে পড়ে?"

"অবশ্যই আস্তে পড়ে। সবাই জানে।"

"তাহলে একটা ভারী জিনিষকে যদি আস্তে ফেলতে চাই তাহলে তার সাথে কয়েকটা হালকা জিনিষ বেঁধে দিতে পারব স্যার। হালকাগুলো আস্তে পড়াবে তাই ভারী জিনিষটা তাড়াতাড়ি পড়তে পারবে না।"

কালাপাহাড় স্যার কিছু একটা চিন্তা করলেন তারপর বললেন, "সেটাই তো হবে। এটা কেন জিজ্ঞেস করছিস?"

মিঠুনের মুখে হঠাৎ একটা ফিচলে হাসি ফুটে উঠল, "কিন্তু স্যার ভারী জিনিষটার সাথে হালকা জিনিষগুলো বেঁধে দেয়ার জন্যে সব মিলিয়ে ওজন

আগের থেকে বেশি হয়ে গেল না?"

"হয়েছে। তাতে সমস্যা কী?

"আগের থেকে ভারী হবার কারণে এখন কী আগের থেকে তাড়াতাড়ি পড়বে না? ভারী জিনিষ তো তাড়াতাড়ি পড়ে।

কালাপাহাড় স্যারকে কেমন জানি বিভ্রান্ত দেখাল। বললেন, "কী বললি?"

"বলেছি ভারী জিনিষটাকে আস্তে ফেলার জন্যে তার সাথে হালকা জিনিষ বেঁধেছি- কিন্তু এখন পড়ছে তাড়াতাড়ি-"

কালাপাহাড় স্যারের মুখ থমথম করতে লাগল, হুংকার দিয়ে বললেন, "তুই কী বলতে চাস?"

মিঠুন বলল, "আমি কিছু বলতে চাই না শুধু জিজ্ঞেস করছি। এক ভাবে চিন্তা করলে আস্তে পড়বে, অন্যভাবে চিন্তা করলে তাড়াতাড়ি পড়বে, কোনটা সত্যি? দুইটাই তো সত্যি হতে পারে না। এটাকে সমাধান করার একটা মাত্র উপায়। সেটা হচ্ছে যদি আমরা মেনে নেই ভারী আর হালকা জিনিষ যদি এক সাথে পড়ে। তার মানে স্যার কোনো এক্সপেরিমেন্ট করার দরকার নাই শুধু যুক্তি দিয়ে দেখানো যায় ভারী আর হালকা জিনিষ এক সাথে নিচে পড়ে।"

কালাপাহাড় স্যারকে কেমন বিভ্রান্ত দেখাল, খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "এটা তোর যুক্তি হল? এটা হচ্ছে কুযুক্তি। যতো রকম কুযুক্তি। বদযুক্তি।"

আমরা বুঝতে পারলাম মিঠুন শেষ পর্যন্ত স্যারকে যুক্তি দিয়ে আটকে ফেলেছে। মিঠুন মিন মিন করে বলল, "না স্যার এইটা কুযুক্তি না। এইটা আমি এক বইয়ে পড়েছি।"

"যত্তোসব। আউটবই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। ঐগুলো পড়ে ব্রেন নষ্ট।"

বলে স্যার থপ থপ করে, বের হয়ে গেলেন। আমরা চাপা গলায় আনন্দের মত শব্দ করলাম।

মিঠুন বলল, "যাক বাবা বাঁচা গেল।"

আমি বললাম, "আরেকটু হলে কিলিয়ে স্যার তোকেই ব্ল্যাক হোল বানিয়ে দিত।"

মিঠুন মুখ শক্ত করে বলল, "কিলিয়ে ব্ল্যাক হোল তৈরী করা যায় না।

ব্ল্যাক হোল তৈরী হওয়ার নিয়ম আছে।" বৈজ্ঞানিক জিনিষ নিয়ে ভুল কথা বললে মিঠুন খুব বিরক্ত হয়।

আসল ব্ল্যাক হোল কী জিনিষ সেটা কেমন করে তৈরি করতে হয়, সেটা তৈরী হলে কী হয় আমি কিছুই জানি না কিন্তু মিঠুনের ব্ল্যাক হোলের বাচ্চাটা কী করতে পারে সেটা আমি সেদিন সন্ধেবেলা টের পেলাম।

সারাটাদিন গুমোট গরম ছিল, সন্ধেবেলা আকাশ কালো করে মেঘ জমা হতে শুরু করল। মেঘ আমার খুব ভালো লাগে, আকাশে কতো রকম মেঘ থাকে ভালো করে লক্ষ্য না করলে কেউ সেটা দেখতেও পাবে না। আমি তাই মেঘ দেখার জন্যে বাসায় ছাদে উঠে গেলাম।

মনে হতে লাগল মেঘগুলো বুঝি জীবন্ত কোনো প্রাণী, আকাশের এক কোণা থেকে পাক খেয়ে খেয়ে আসতে থাকে, আসতে আসতে এটা পাল্টে যেতে থাকে, কখনো এক জায়গায় জড়ো হয় আবার কখনো ছড়িয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে কালো মেঘের ভিতর বিদ্যুতের ঝলকানি হতে থাকে। মনে হয় দূরে কোথাও বুঝি মেঘের ভেতর আলো আটকে রেখেছে, মেঘটা টুকরো করে সেই আলো বের হয়ে আসবে। অনেক দূরে বিজলী চমকাতে থাকে আর একটু পর মেঘের গুড়গুড় শব্দ শুনতে পেলাম– আমার এটা শুনতে কী যে ভালো লাগে!

আমি সার্টের বোতাম খুলে ছাদে হাঁটতে থাকি, যখন প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা পড়বে সেই বৃষ্টিতে ভিজতে কী যে মজা সেটা যারা বৃষ্টিতে ভিজে শুধু তারাই জানে। আকাশে ঠিক আমার মাথার উপর বিজলী চমকাতে থাকে আর ঠিক তখন খুব বিচিত্র একটা ঘটনা ঘটল। ছাদে চিলেকোঠায় আমার যে ঘরটা আমি মিঠুনকে তার ল্যাবরেটরি তৈরী করতে দিয়েছি সেই ঘরটার ভিতরে খুট খুট করে একটা শব্দ হল। আমার মনে হল ঘরের ভেতরে কেউ একজন আছে, আমি চমকে উঠলাম আর ভয়ে আমার বুকটা কেঁপে উঠল।

আমি প্রথমে ভেবেছিলাম বুঝি শুনতে ভুল করেছি, মেঘের সাথে সাথে একটু ঝড়ো বাতাস দিচ্ছে, এই বাতাসের জন্যে হয়তো দরজা কিংবা জানালা কেঁপে শব্দ হচ্ছে। একটু পর বুঝতে পারলাম— আসলে এটা দরজা জানালার শব্দ না, ঘরের ভিতরে কিছু একটা নড়ছে। আমার ভয়টুকু বাড়তে লাগল, শুনতে পেলাম ভেতরে খট খট শব্দটাও আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে কোনো একটা জীবন্ত প্রাণী ঘরের ভেতরে ছোটাছুটি

করছে।

তখন হঠাৎ করে আরো বিচিত্র একটা ব্যাপার ঘটতে শুরু করল। আমি দেখলাম দরজার নিচ দিয়ে নীল একটা আলো বের হতে শুরু করছে। খট খট শব্দের সাথে সাথে আলোটা বাড়ছে আর কমছে।

প্রথমে আমার ইচ্ছে হল এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যাই, অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলাম— তারপর অনেক সাহস করে আমি আস্তে আস্তে চিলোকোঠার ছিটকানী খুলে দরজাটা খুললাম, তখন ভেতরে যে দৃশ্যটি দেখলাম তাতে আমার হার্টফেল করার অবস্থা।

মিঠুনের ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা আমরা যে বাক্সটার মাঝে রেখেছিলাম সেখান থেকে নীল রংয়ের একটা আলো বের হচ্ছে, শুধু তাই না সেখানে থেকে শুড়ের মতো আলোর ঝলকানি বের হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, জীবন্ত প্রাণীর মত সেটা নড়ছে। শুধু তাই না মনে হচ্ছে বাক্সটা জীবন্ত, ভোঁতা একটা শব্দ করে সেটা নড়ছে, কাঁপছে, লাফাচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে যাচ্ছে। স্পষ্ট মনে হতে থাকে এই বাক্সটার ভিতরে আমরা জীন ভূত কিছু একটা ঢুকিয়ে রেখেছি, সেটা এখন বের হতে চেষ্টা করছে।

ভয় পেয়ে আমি একটা চিৎকার করে দৌড় দিতাম কিন্তু ঠিক তখন খুব কাছাকাছি কোথাও একটা বাজ পড়ল, আর সাথে সাথে বাক্সটা থেমে গেল, আলো নিভে গেল, বাক্স থেকে বের হয়ে আসা আলোর শুড়গুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখে কে বুঝবে একটু আগে এই বাক্স থেকে এরকম বিচিত্র একটা জিনিষ বের হচ্ছিল।

আমি ঘরের লাইট জ্বালিয়ে বাক্সটার কাছে গেলাম, ঘরে একটা পোড়া গন্ধ। বাক্সটা গরম এবং দেখে মনে হল এটা রীতিমত ঝলসে গেছে। বাক্সটার ভেতর যে শিশিটাতে ব্লাকহোলের বাচ্চাকে রাখা হয়েছিল সেই শিশিটার মুখটা খোলা। আমি খুব সাবধানে শিশিটা হাতে নিলাম, শিশিটা বেশ ভারী। নাড়তেই মনে হল ভিতরে কিছু একটা নড়ল। আমি শিশির ছিপিটা খুঁজে বের করে শিশিটার ছিপি আটকে দিলাম। বাক্সের ভেতর শিশিটা কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে দিয়েছিলাম দেখলাম কাপড়টা জায়গায় জায়গায় পুড়ে গিয়েছে।

আমি কী করব বুঝতে না পেরে যেভাবে শিশিটা আগে রেখেছিলাম ঠিক সেভাবে রেখে দিলাম। আবার সেটা নড়তে শুরু করে কী না, আলো

বের হতে থাকে কী না দেখার জন্যে আমি বেশ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম কিন্তু কিছু হল না।

ঠিক তখন বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, আমি তখন দরজা বন্ধ করে বের হয়ে ছাদে হাঁটতে হাঁটতে বৃষ্টিতে ভিজতে শুরু করলাম। চিলেকোঠায় ব্ল্যাকহোলের বাচ্চাটা যে সব কাণ্ড কারখানা করেছে আমি তার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। মিঠুন কী বুঝবে?"

পরদিন ক্লাশে মিঠুনকে যখন এটা বললাম সে জিজ্ঞেস করল,"যখন বাজ পড়েছে তখন ব্ল্যাকহোলের বাচ্চার কাজকর্ম থেমে গেল?"

"হ্যাঁ"।

"বাজ পড়ার আগে পর্যন্ত সেটা নড়াচড়া করছিল? আলো বের হচ্ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক তো?"

"ঠিক।"

মিঠুন তখন বুঝে ফেলার মত ভাব করে মাথা নাড়ল, আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

"যেটা ভাবছিলাম তাই।"

"কী ভাবছিলি?"

"আমি তো ব্ল্যাকহোলের বাচ্চাটা এখনো টেস্ট করি নাই। আমার একটা টেস্ট করার কথা ছিল ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগানেটিক ফিল্ড দিয়ে। সেটা আর করা লাগবে না। টেস্ট হয়ে গেছে।"

"মানে?"

"কাছাকাছি যখন বাজ পড়ে তার আগে আগে সেই জায়গায় এক ধরণের ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হয়। তোর বাসায় সেই ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরী হয়েছিল, ব্ল্যাকহোলের বাচ্চাটা সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডের মাঝে যখন ঢুকেছে তখন নিশ্চয়ই এনার্জি রিলিজ করতে শুরু করেছে।"

আমি মিঠুনের কোনো কথাই বুঝতে পারলাম না, তাই বোকার মতন মাথা নাড়লাম। মিঠুন জোরে জোরে চিন্তা করতে লাগল, "কিন্তু এনার্জিটা আসে কোথা থেকে?"

আমিও ভান করলাম এনার্জিটা কোথা থেকে আসে সেটা নিয়ে আমারও খুব চিন্তা হচ্ছে।

মিঠুন বিড় বিড় করতে করতে বলল, "এক হতে পারে ই ইকুয়েলস টু এমসি স্কয়ার। তুই তাহলে এর অর্থ চিন্তা করতে পারিস?"

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না তারপরও জিনিষটা নিয়ে ভাবছি এরকম ভাণ করে মাথা নাড়লাম।

মিঠুন বলল, "তার অর্থ এমন একটা জিনিস পেয়েছি সেটা দিয়ে সাংঘাতিক সব কাজ করে ফেলা যাবে। পৃথিবীর মানুষ চিন্তাও করতে পারবে না আমাদের কাছে কী আছে।"

আমি বললাম, "তোর কথা যদি সত্যি হয় তাহলে এর কথা এখন কাউকে বলা যাবে না।"

"হ্যাঁ। এখন আমাদের কয়েকজন ছাড়া আর কাউকে এর কথা বলা যাবে না। তার আগে পুরোটা আমাদের এক্সপেরিমেন্টটা করে দেখতে হবে।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কখন করবি?"

"আজকেই।"

আমি মাথা নাড়লাম, "মিঠুন বলল, দেরী করতে পারব না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে।"

সত্যিকারের স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীরা যখন ইচ্ছে বের হতে পারে না কিন্তু আমাদের মহব্বতজান স্কুলে এটা কোনো ব্যাপারই না। আমি আর মিঠুন স্কুল ছুটির দুই পিরিওড আগে ফুড়ুত করে বের হয়ে গেলাম কেউ লক্ষও করল না।

আমাদের বাসায় যাবার আগে মিঠুন আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তোর বাসায় ব্যাটারী আছে?"

আমি মাথা চুলকালাম, বললাম "থাকলেও এখন তো খুঁজে পাব না।"

"টেলিভিশনের রিমোট আছে?"

"আছো।"

"তাহলেই ব্যাটারী পেয়ে যাব। এখন দরকার দুই টুকরা তার।"

"পুরানো একটা টেবিল ল্যাম্প আছে।"

মিঠুন হাতে কিল দিয়ে বলল, "গুড! এখন দরকার এলুমিনিয়াম ফয়েল। পান বিড়ি সিগারেটের দোকানে পেয়ে যাব।"

রাস্তার পাশে ছোট একটা পান, বিড়ি সিগারেটের দোকান থেকে একটা খালি সিগারেটের প্যাকেট চেয়ে নিলাম তার ভেতরে খানিকটা রাংতা পাওয়া গেল। মিঠুন খুশি হয়ে মাথা নাড়ল, এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য তার যা কিছু দরকার তার সবকিছু হয়ে গেছে।

হেঁটে হেঁটে বাসায় এসে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। মিঠুনের এক্সপেরিমেন্ট করার জন্যে রিমোটের ব্যাটারি দুটো খুলে নিলাম। ভালই হয়েছে আব্বু এখন বাসায় নেই, যতক্ষণ বাসায় থাকেন সোফায় আধাশায়া হয়ে টিভি দেখেন— তখন রিমোট খুলে ব্যাটারি নেয়া এতো সোজা হত না! পড়ার ঘর থেকে আমার পুরানো টেবিলে ল্যাম্পটা নিয়ে নিলাম তারপর মিঠুনকে নিয়ে ছাদে আমার চিলেকোঠায় হাজির হলাম।

মিঠুন ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা রাখা বাক্সটা নিয়ে সাবধানে সেটা খুলল, ভেতরে জায়গায় জায়গায় পুড়ে গেছে, একদিকে পুড়ে একটা বড় গর্ত পর্যন্ত হয়ে গেছে। মিঠুন সাবধানে শিশিটা বের করে একবার নেড়ে দেখল, ভেতরে কিছু দেখা যায় না কিন্তু বোঝা যায় শিশিটাতে কিছু একটা আছে।

মিঠুন শিশিটার দুই পাশে দুই টুকরা রাংতা ল্যাপ্টে লাগিয়ে নেয়। তারপর টেবিল ল্যাম্প থেকে দুই টুকরা তার ছিঁড়ে নিয়ে উপরের প্লাস্টিক সরিয়ে ভেতরের তার বের করে নেয়। দুইটা তার শিশির দুই পাশের রাংতার সাথে প্যাঁচিয়ে নিয়ে সে শিশিটা মেঝেতে রাখল। তারপর আমাকে বলল, রিমোটের ব্যাটারিগুলো বের করতে। আমি ব্যাটারি দুটো বের করার পর মিঠুন সাবধানে তারের দুই মাথা ব্যাটারির দুই পাশে লাগাতেই তুলকালাম একটা কাণ্ড ঘটল। শিশিটার ছিপিটা গুলির মতো উপরে ছুটে গেল আর শিশির ভেতর থেকে জ্বলন্ত নীলাভ আলোয় একটা শিখার মতো লকলকে কিছু একটা বের হয়ে ছাদে আঘাত করল। পুরো ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটল যে আমরা রেডি হবার সময় পর্যন্ত পেলাম না— কোনোমতে তার ব্যাটারি খুলে ছিটকে সরে গেলাম। কানেকশান ছুটে যেতেই সেই লকলকে শিখাটা সুড়ুৎ করে শিশির ভেতরে ঢুকে গেল।

মিঠুনের চোখ চকচক করতে থাকে। কোনোমতে নিশ্বাস আটকে বলল, "প্লাজমা!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "প্লাজমা কী?"

" কোনো গ্যাস যখন আয়োনাইজ হয়, সেটাকে বলে প্লাজমা।"

"আয়োনাইজ মানে কী?"

"গ্যাসের ইলেকট্রনকে যখন ছুটিয়ে নেয় তখন বলে আয়োনাইজ হওয়া।

"ইলেকট্রন কেন ছুটে যাচ্ছে?"

"কোনো এক ধরনের শক্তি বের হচ্ছে— সেই শক্তি ছুটিয়ে দিচ্ছে।"

মিঠুন জ্বলজ্বলে চোখে বলল, "সাধারণত লো প্রেসারে প্লাজমা তৈরী হয়। এখানে গ্যাসের স্বাভাবিক চাপেই হয়ে যাচ্ছে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তার মানে কী?"

"তার মানে প্রচণ্ড এনার্জি বের হচ্ছে।"

"সেটা ভালো না খারাপ?"

"সেটা ফ্যান্টাস্টিক।" মিঠুন চোখ বড় বড় করে বলল, "সেটা অসাধারণ।"

ব্যাটারি লাগালে কী হতে পারে সেটা যেহেতু জেনে গেছি তাই এর পরে আরেকটু সাবধানে কানেকশন দেয়া হলো, আবার শিশির ভেতর থেকে জীবন্ত প্রাণীর মত লকলকে প্লাজমা ভয়ঙ্কর শব্দ করে বের হয়ে আসে, সারা ঘরে ওষুধের মতো একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। প্লাজমাটা ছাদে যেখানে গিয়ে ধাক্কা খেল সেখান থেকে প্যালেস্তারা খসে পড়ল! মিঠুন সেটা দেখে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে।

কয়েকবার এক্সপেরিমেন্ট করে মিঠুন সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়ল। তারপর শিশিটা আবার বন্ধ করে বাক্স রেখে দেয়। বাক্সে রাখার আশা এবার সে রাংতা দিয়ে ভালো করে মুড়ে নেয় তাহলে লাল ইলেকট্রিক ফিল্ড ঢুকতে পারবে না। আশপাশে বাজ পড়লেও সমস্যা নেই।

স্কুল ছুটির পর আমরা বাসায় যাচ্ছি, কোর্টের কাছাকাছি কিছু একটা দেখে মিঠুন দাঁড়িয়ে গেল। আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। কোর্টে দেওয়ালে একটা পোস্টার, পোস্টারে বড় বড় করে লেখা, আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা। নিচে লেখা আমাদের ছোট শহরের সব স্কুল কলেজ মিলে একটা আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তিনদিন ধরে এই মেলা চলবে, শেষ দিনে পুরস্কার দেয়া হবে।

মিঠুন বলল, "আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা, আমরা সেখানে যোগ দিচ্ছি না কেন?"

"বিজ্ঞান মেলায় যোগ দিব? আমরা?" বলে ঝুম্পা হি হি করে হাসতে লাগল। জিনিষটা এতোই হাস্যকর যে আমরাও হি হি করে হাসতে লাগলাম।

মিঠুন অবাক হয়ে বলল, "এর মাঝে হাসির কী আছে? গত বছর বিজ্ঞান বেলায় আমি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিলাম।"

আমি বললাম, "গত বছর তুই ছিলি অক্সব্রীজ স্কুলে। এই বছর তুই মহব্বতজান স্কুলে। মহব্বতজান স্কুল থেকে কেউ কোনোদিন বিজ্ঞান মেলায় যোগ দেয় নাই।"

মিঠুন মুখ শক্ত করে বলল, "এটা হতেই পারে না যে আমরা বিজ্ঞান মেলায় যোগ দিব না। আমাদেরকে জানানো হল না কেন? আমাদের স্কুলে চিঠি পাঠানো হল না কেন?"

ঝুম্পা হি হি করে হেসে বলল, "নিশ্চয়ই চিঠি পাঠিয়েছে। সেই চিঠি কেউ কোনোদিন খুলে দেখে নাই। সোজাসুজি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।"

আমি বললাম, "ভালই হয়েছে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, চিঠি খুললে এর ভিতরে কী লেখা আছে কেউ কোনোদিন বুঝতে পারত না। এই স্কুলের কেউ বিজ্ঞান বানান পর্যন্ত করতে পারে না।"

মিঠুন বলল, "আমি এখনই খোঁজ নিব বিজ্ঞান মেলায় যোগ দিতে হলে

কী করতে হয়। তারপর কাল স্যারদেরকে বলব।"

বগা বলল, "তোর ইচ্ছা হলে বল, আমি আগে থেকে তোকে বলে দিতে পারি বলে কোনো লাভ হবে না। ক্ষতি হতে পারে।"

"ক্ষতি? কী ক্ষতি হবে?"

"এটা বলার জন্যে তোকে আচ্ছামতন বানাতে পারে। স্যারেরা তোকে সাইজ করে ছেড়ে দিতে পারে।"

"সাইজ করলে করবে। আমি স্যারকে বলব।"

পরের দিন ক্লাশে বিজ্ঞান স্যার আসতেই মিঠুন দাঁড়িয়ে গেল, বলল, "স্যার।"

কালাপাহাড় স্যার খুব অবাক হলেন। এই স্কুলে নিজে থেকে কোন ছাত্র-ছাত্রী, স্যারদের কিছু বলে না, স্যারেরা কিছু বললে তার উত্তর দেয়। কালাপাহাড় স্যার ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল?"

"আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা পরশু দিন থেকে। আমাদের স্কুল থেকে আমরা যোগ দিতে চাই।"

"কীসে যোগ দিতে চাস?"

"বিজ্ঞান মেলা। সায়েন্স ফেয়ারে স্যার।"

কালাপাহাড় স্যারের ভুরু আরো বেশী কুঁচকে গেল, "সেটা আবার কী?"

"আমরা স্যার বিজ্ঞানের প্রজেক্ট নিয়ে যাব। যে স্কুলের প্রজেক্ট ভালো হবে সেই স্কুল পুরস্কার পাবে।"

কালাপাহাড় স্যার মিঠুনের কথা শুনে হা হা করে হাসতে শুরু করলেন। আমরা এর আগে কখনো কালাপাহাড় স্যারকে হাসতে দেখিনি। তাঁর হাসি দেখে ভয়ে আমাদের আত্মা শুকিয়ে গেল। একজন মানুষ হাসলে তাকে যে এতো ভয়ংকর দেখাতে পারে আমরা সেটা জানতাম না। মিঠুনের কথাটা এতোই অবাস্তব যে স্যার তার উত্তরে কিছু বলা দরকার পর্যন্ত মনে করলেন না। হাসতে হাসতে চেয়ারে ঠেলে ঢুকে পড়ে বসে ঘুমিয়ে গেলেন।

ক্লাশের পর মিঠুন বলল, "বিজ্ঞান স্যার যদি রাজী না থাকে তাহলে আমরা হেড স্যারের কাছে যাব।"

বগা জিজ্ঞেস করল, "হেড স্যার? হেড স্যার কে?"

দেখা গেল আমরা কেউই মহব্বতজান স্কুলের হেড স্যার কে সেটা

জানি না। এই স্কুল, স্কুলের স্যার ম্যাডাম কোনো কিছু নিয়েই আসলে আমাদের উৎসাহ নাই। আমরা স্কুলে আসি, স্যার ম্যাডামদের বকাবকিইনি, পিটুনি খাই তারপর বাসায় চলে যাই। স্কুলের এসেম্বলী হয় না, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না তাই যে সব স্যার ম্যাডাম আমাদের ক্লাশে আসেন না আমরা তাদেরকে চিনিও না।

মিঠুনের উৎসাহের জন্যে শেষ পর্যন্ত একটা দরখাস্ত লিখে আমরা কয়েকজন হেড স্যারের সাথে দেখা করতে গেলাম, যেতে যেতে আমাদের দলটা বেশ ভারী হয়ে গেল। মিঠুনের সাথে আমি, বগা, ঝুম্পা, ফারা তো আছিই, গুললু এমন কী রোল নম্বর তেতাল্লিশ পর্যন্ত আমাদের পিছু পিছু রওনা দিল।

আমরা আবিষ্কার করলাম স্কুলের একটা অফিস আছে আর সেই অফিসের পাশে হেড মাস্টারের রুম। দরজায় ভারী পর্দা তাই ভেতরে কেউ আছে কী না বোঝা গেল না। মিঠুন তাই আমাদেরকে নিয়ে প্রথমে অফিসে হাজির হল। সেখানে শেয়ালের মত দেখতে একজন মানুষ টেবিলে ঝুঁকে এক কপি দৈনিক মহব্বত পড়ছে। আরেক পাশে একজন চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আমাদের স্যার ম্যাডামরা যেরকম কোনো কাজ কর্ম করেন না, অফিসের লোকজনেরাও সেরকম কোনো কাজকর্ম করে না।

আমাদের দেখে শেয়ালের মত মানুষটা বলল, "কী ব্যাপার?"

মিঠুন বলল, "আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলায় আমাদের স্কুল থেকে টিম পাঠানোর ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।"

মানুষটা বলল, "অ।" তারপর আবার দৈনিক মহব্বত পড়তে শুরু করল। যে মানুষটা ঘুমাচ্ছিল সে হঠাৎ জেগে উঠল, চমকে উঠে বলল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে? এঁ্যা? কী হয়েছে?"

ঝুম্পা বলল, "আমরা হেড স্যারের সাথে দেখা করতে এসেছি।"

শেয়ালের মত মানুষটা দৈনিক মহব্বত থেকে চোখ না তুলে বলল, "দেখা হবে না। যাও।"

ঘুম থেকে জেগে ওঠা মানুষটা বলল, "কেন? কেন দেখা করতে চাও? কী হয়েছে? হ্যাঁ? কী হয়েছে?"

ঝুম্পা বলল, "আয় যাই। এইখানে কথা বলে লাভ নাই।"

তাই আমরা অফিস থেকে বের হয়ে সরাসরি হেড স্যারের রুমের সামনে দাঁড়ালাম। মিঠুন পর্দা সরিয়ে বলল, "স্যার, আসতে পারি?"

আমরা সবাই তখন হেড স্যারকে দেখলাম, বড় একটা টেবিলের সামনে বসে দৈনিক মহব্বত পড়ছেন। হেড স্যারকে দেখে আমরা সবাই বুঝতে পারলাম এই মানুষটাকে আমরা আগেও দেখেছি। মানুষটা যে হেড মাস্টার বুঝতে পারি নাই, ভেবেছি দপ্তরী না হয় কেরানী।

হেড স্যার চোখ পাকিয়ে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হইছে?"

"আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই। আসব স্যার?"

আমি নিশ্চিত ছিলাম হেড স্যার ধমক দিয়ে বের করে দিবে। কিন্তু মিঠুনের চোখে চশমা, কথা বলার স্টাইল এগুলো দেখে মনে হয় হেড স্যার একটু অবাক হলেন, বললেন, "আয়।"

মিঠুনের পিছু পিছু আমরা সবাই ঢুকে গেলাম, হেড স্যার তখন একটু চমকে উঠলেন, আমরা এতোজন ঢুকে যাব বুঝতে পারেননি। আঁতকে উঠে বললেন, 'এঁ্যা! এতোজন? এতোজন আসার দরকার কী?"

মিঠুন বলল, "স্যার। আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা হচ্ছে, আমরা সেই মেলায় যোগ দিতে চাই।"

হেড স্যার মিঠুনের কথা শুনে খুবই অবাক হলেন, কয়েকবার চেষ্টা করে বললেন, "কিসের জন্য? হেইখানে গিয়া মাইরপিট করবি?"

মিঠুন বলল, "না স্যার। আমরা সায়েন্স প্রজেক্ট নিয়ে যাব।"

"প্রজেক্ট পাইবি কই? বাজারে কিনতে পাওয়া যায়?"

"না স্যার। আমরা প্রজেক্ট তৈরি করব।"

"তোরা প্রজেক্ট তৈরি করবি? আমারে সেই কথাটা বিশ্বাস করতে কইতাছস?

"জী স্যার। আমরা ল্যাবরেটরি ঘরটা ঠিক করেছি। সেখানে প্রজেক্ট তৈরি হবে।"

"এই স্কুলে কারা পড়ে তুই জানস? এই স্কুলে পড়ে শহরের যত চোর ডাকাইত গুণ্ডা বদমাইসের পোলাপান। এই পোলাপান বড় হইয়া কী হইব জানস? তারাও বড় হইয়া হইব চোর ডাকাইত গুণ্ডা বদমাইস। তাই আমার লগে মশকরা করনের দরকার নাই। বিজ্ঞান মেলায় যাওনের কথা বলার দরকার নাই। চুরি ডাকাতি গুণ্ডা বদমাইসী করনের মেলা থাকলে খবর নিস কয়েক হালি টিম পাঠামু।"

মিঠুন শেষ চেষ্টা করল, বলল, "স্যার আপনাকে কিছুই করতে হবে না। আমরা সবকিছু করব। আমরা একটা দরখাস্ত লিখে এনেছি, আপনি শুধু

একটা সাইন দিয়ে দিবেন তাহলেই আমাদের টিমকে জায়গা দিবে। আমরা সব কিছু করব। খালি একটা সাইন।"

হেড স্যার খেঁকিয়ে উঠলেন, "যা! ভাগ।"

"একটা খালি সিগনেচার স্যার।"

"দূর হ এইখান থেকে। পাজী বদমাইস বেআদপ বেআক্কেল বেতমিজ।" এক নিঃশ্বাসে বে দিয়ে শুরু এতোগুলো শব্দ বলা যেতে পারে আমরা কখনো চিন্তা করি নাই।

মিঠুন প্রায় ভাঙ্গা গলায় বলল, "আমাদের খুব শখ ছিল স্যার। আপনি শুধু একটা সাইন দিবেন স্যার। প্লীজ স্যার।"

হেড স্যার এইবার লাফ দিয়ে উঠলেন, চিৎকার করে বললেন, "কথা কানে যায় না। হেই মাইনকা, আমার বেতটা লইয়া আয় তো।"

হঠাৎ পিছন থেকে অপরিচিত একটা গলার স্বর শুনতে পেলাম, কে যেন বলল, "এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নাই। আমি তোমাদের পারমিশান নিয়ে দেব। আমাকে দরখাস্তটা দাও।"

কে কথা বলে দেখার জন্যে আমরা ঘুরে তাকালাম, অবাক হয়ে দেখলাম রোল নাম্বার তেতাল্লিশ দরখাস্তটা নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে। সে কোনোদিন কথা বলে নাই তাই আমরা কোনোদিন তার গলায় স্বর শুনি নাই। মিঠুন কী করবে বুঝতে না পেরে রোল নাম্বার তেতাল্লিশকে দরখাস্তটা দিল। হেড স্যার কেমন যেন ভ্যাবেচেকা খেয়ে গেলেন, তারপরে হুংকার দিয়ে বললেন, "তুই কোন লাটসাহেবের বাচ্চা? তুই কোনখান থাইকা পারমিশান আনবি?"

"হাজী মহব্বতজান আমার চাচা। আমি চাচার কাছ থেকে পারমিশান আনব।"

জোঁকের মুখে চুন পড়লে জোঁকের যেরকম অবস্থা হয় হেড স্যারের ঠিক সেই অবস্থা হল। এক সেকেন্ডের মাঝে তার মুখটা রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেল। হেড স্যার কেমন যেন কাঁপতে লাগলেন, তার মুখটা একবার খুলতে লাগল একবার বন্ধ হতে লাগল। কয়েকবার চেষ্টা করে বললেন, "তু-তু-ই মানে তু-তু-তুমি হা-হাজী সাহেবের ভা-ভা-ভাতিজা? সেইটা তো আগে বলবা।"

রোল নাম্বার তেতাল্লিশ আমাদের বলল, "আয় যাই।"

হেড মাস্টার তখন প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, "না না যাইও না।

দরখাস্তটা দেও আমি সিগনেচার কইরা দেই।" হেড স্যার টেবিলের পিছন থেকে ছুটে আসতে চেষ্টা করলেন, শেলফ টেবিল চেয়ারে ধাক্কা খেলেন, একটা চেয়ার উল্টে পড়ে গেল।

রোল নাম্বার তেতাল্লিশ বলল, "চাচার কাছ থেকে সিগনেচার নিলে ভালো। সায়েন্স ফেয়ারে কিছু খরচ হয়। ভলান্টিয়ারদের খাওয়া দিতে হয় টুকিটাকি যন্ত্রপাতি কিনতে হয় যাতায়াতের খরচ হয়। চাচা সেই ফান্ডটার ব্যবস্থা করে দিবে।"

হেড স্যার প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, "আমি স্কুল ফান্ড থেকে ব্যবস্থা কইরা দিমু।" তারপর রোল নাম্বার তেতাল্লিশের হাত থেকে দরখাস্ত টা ছিনিয়ে নিয়ে সেখানে সিগনেচার করে দিলেন। তারপর চিৎকার করে বললেন, "মানিক্যা আমার সিল আর চেক বইটা তাড়াতাড়ি আন।"

আমরা কিছুক্ষণ পর বিজয়ীর মত হেড স্যারের সিগনেচার সিলসহ দরখাস্ত আর পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক নিয়ে বের হলাম। সবাই যখন হই হই করতে করতে যাচ্ছে তখন আমি একটু পিছিয়ে রোল নাম্বর তেতাল্লিশকে ধরলাম। বললাম, "তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?"

রোল নাম্বার তেতাল্লিশ কোনো কথা না বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, "হাজী মহব্বতজান আসলে তোর কেউ হয় না, তুই হেড স্যারের রুমে যা বলেছিস সেগুলো পুরোটা বানানো। ঠিক?"

রোল নাম্বার তেতাল্লিশের মুখে খুবই সূক্ষ্ম একটা হাসি ফুটে উঠল। আমি বললাম, "পুরোটা একটা ভাওতাবাজী। ঠিক?"

রোল নাম্বার তেতাল্লিশের মুখের হাসিটা একটু বিস্তৃত হল। তারপর হ্যাঁ বলার ভঙ্গী করে সে মাথাটা ওপর থেকে নিচে নামাল। আমার দিকে তাকিয়ে একবার চোখ টিপল তারপর একটা আঙুল ঠোঁটের উপর রাখল।

আমি গলা নামিয়ে বললাম, "ভয় নাই। আমি কাউকে বলব না।"

বছর খানেক পরে রোল নাম্বার তেতাল্লিশ আমাদের স্কুল থেকে চলে গিয়েছিল, এর মাঝে সে আর একটা কথাও বলেনি।

বিজ্ঞান মেলায় যাবার জন্যে অনেক ছেলে মেয়ে ল্যাবরেটরিতে হাজির হল। শুধু ছেলে মেয়ে না, কয়েকজন স্যার ম্যাডামও চলে এলেন। আমরা একটু পরে বুঝতে পারলাম হাজী মহব্বতজান স্কুলের ইতিহাসে যেটা ঘটেনি সেটা ঘটেছে, প্রথমবার স্কুল ফান্ড থেকে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। সেই

টাকা দিয়ে খাওয়া দাওয়া করা ছেলেমেয়েদের প্রধান উদ্দেশ্য আর ভাগ বাটোয়ারা করা স্যারদের উদ্দেশ্য।

সবাইকে নিয়ে বসায় কিছুক্ষণের মাঝেই বোঝা গেল বিজ্ঞান মেলা কী জিনিষ, কেমন করে বিজ্ঞান মেলা করতে হয় সেটা নিয়ে মিঠুন ছাড়া আর কারো কোনো ধারণা নেই। বেশীর ভাগ ছেলেমেয়ের ধারণা ছিল এটা যেহেতু মেলা এখানে কিছু একটা বিক্রি করতে হবে। মিঠুন বোঝাল এখানে বিজ্ঞানের প্রজেক্ট না হয় বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে যেতে হবে। সবাই সেটা দেখতে আসবে আর যেটা ভালো হবে সেটাকে পুরস্কার দেয়া হবে।

বিজ্ঞানের কী প্রজেক্ট নেওয়া যায় সেটা নিয়ে প্রথমে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করা হল কিন্তু খুব লাভ হল না। যেমন একজন বলল, "আমি একবার ইলেকট্রিক শক খেয়েছিলাম। খুবই আজিব ব্যাপার এক শক খেয়েই আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম, বিজ্ঞান মেলায় তাই আমরা সবাইকে ইলেকট্রিক শক দিতে পারি। খুবই সোজা, খালি প্লাগপয়েন্ট লাগবে আর একটা তার লাগবে।"

আরেকজন বলল, "একটা গরু নিয়ে যেতে পারি। গরুর গোবর দিয়ে সার তৈরী হয়। গোবরটা কোথা থেকে আসে সবাই দেখতে পারবে। খুবই বৈজ্ঞানিক দৃশ্য।"

আরেকজন বলল, "এক বস্তা তেলাপোকা নিয়ে যেতে পারি। যখন অনেক ভীড় হবে তখন তেলাপোকাগুলো ছেড়ে দিতে পারি, সেইগুলো যখন উড়বে তখন পাবলিক দৌড়াবে। খুবই বৈজ্ঞানিক।"

আরেকজন বলল, "ব্যাঙকে কয়েকটা আছাড় দিলে সেইটা কাহিল হয়ে যায়। তখন সেটা লাফ দিতে পারে না। মানুষের মতো হাঁটে। খুবই বৈজ্ঞানিক দৃশ্য।"

আরেকজন বলল, "লোহার রড গরম করে ছ্যাঁকা দিতে পারি। তখন শিক কাবাবের মতো গন্ধ বের হয়। সেটা দেখাতে পারি।"

এরকম সময় আমি মিঠুনকে ফিস ফিস করে বললাম, "খামোখা আলোচনা করে লাভ নাই। তুই কয়েকটা ঠিক করে দে, যার যার ইচ্ছা তারা সেটা নিয়ে যাবে।"

শেষ পর্যন্ত সেটাই করা হল। মিঠুনের মাথায় বিজ্ঞানের প্রজেক্ট কিলবিল কিলবিল করছে। আমরা সেখান থেকে বেছে বেশ কয়েকটা নিয়ে সেগুলো

তৈরি করতে শুরু করলাম। মিঠুন যখন বলেছে তখন বিষয়টাকে খুবই সোজা মনে হয়েছে, তৈরী করার সময় দেখা গেল জিনিষগুলো আসলে তত সোজা না। তব যন্ত্রপাতির ব্যাপারে মিঠুনের হাত খুব ভালো। সে সত্যি সত্যি প্রজেক্টগুলো দাড়া করে ফেলল।

যেদিন বিজ্ঞান মেলা শুরু হবে আমরা সবাই প্রজেক্টগুলো নিয়ে হাজির হয়েছি। সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত মেলা। সকালে উদ্বোধন অনুষ্ঠান। উদ্বোধন করবে ডিসি না যেন কে। আমাদেরকে বড় একটা হল ঘরে বসিয়ে রাখল, কিন্তু ডিসি সাহেবের দেখা নেই। আমরা গরমে প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেলাম, পাকা দেড়ঘন্টা পর ডিসি সাহেব আসলেন। তারপর শুরু হল বক্তৃতা। বিজ্ঞান যে কতো ভালো সবাই ইনিয়ে বিনিয়ে সেইগুলো বলতে শুরু করল—শুনে শুনে আস্তে আস্তে আমাদের মেজাজ গরম হতে থাকে, কিন্তু কিছু করার নাই তাই চুপ করে সহ্য করলাম। তারপর শুরু হল ডিসি সাহেবকে তেল দেওয়া বক্তৃতা, তিনি এতো ব্যস্ত মানুষ তারপরও সময় করে এসেছেন সে জন্যে পারলে একেকজন তার পায়ে চুমো খেতে শুরু করে।

সবার শেষে ডিসি সাহেব বক্তৃতা শুরু করলেন। ছোট থাকতে তিনি কতো ভালো ছাত্র ছিলেন, কোন পরীক্ষায় কতো মার্কস পেয়েছিলেন, তখন তার স্যারেরা কীভাবে তার সম্পর্কে কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণী কীভাবে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে, এবং তার জীবন থেকে আমাদের কতো কী শেখার আছে— সেটা বলতে শুরু করলেন। বক্তৃতা যখন শেষ হল তখন আমরা সবাই নেতিয়ে পড়েছি, এমন খিদে পেয়েছে যে মনে হচ্ছে ডিসি সাহেবকে ধরে কাবাব বানিয়ে খেয়ে ফেলি।

ডিসি সাহেব আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা তখন হলঘরে বিজ্ঞানের প্রজেক্টগুলো দেখতে গেলেন। অক্সব্রীজ স্কুলের কয়েকটা প্রজেক্ট দেখলেন, ক্যামেরা দিয়ে কয়েকটা ছবি তোলা হল। টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটা কথা বললেন, তারপর চলে গেলেন।

বিকেল বেলা স্কুলের ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা মা আত্মীয় স্বজন আর শহরের প্যবলিক বিজ্ঞান মেলা দেখতে এল। আমরা লক্ষ করলাম আমাদের প্রজেক্টগুলোতে মানুষের বেশী কৌতূহল নাই, মিঠুন অনেক চিন্তা ভাবনা করে একেবারে খাঁটি বিজ্ঞানের প্রজেক্ট তৈরি করেছে (আলো কেন তরঙ্গ, আকাশ কেন নীল, চৌম্বক ক্ষেত্রে চার্জ কেন বল অনুভব করে) কিন্তু সাধারণ পাবলিকরা সেগুলো দেখতে চায় না। মিঠুন আমাদের সবকিছু মুখস্ত করিয়ে

এনেছে আমরা সেগুলো বলার চেষ্টা করি কিন্তু পাবলিক সেগুলো না শুনেই সুড়ুৎ করে সরে যায়।

পাবলিকের ভীড় অক্সব্রীজ স্কুলের প্রজেক্টগুলোর সামনে, তাদের প্রজেক্টগুলোতে বিজ্ঞান খুব কম মজা অনেক বেশী। যেমন একটা ছেলে রবোট সেজে এসেছে। কার্ডবোর্ড দিয়ে শরীর ঢাকা, মাথার ওপর বুকের মাঝে বাতি জ্বলছে। সে রবোটের মতন হাঁটে, মাথা নাড়ে কথা বলে সব পাবলিক সেই রবোটের পিছনে পিছনে ঘুরে। শুধু তাই না সেই রবোটটা হেঁটে হেঁটে আমাদের প্রজেক্টগুলোর পাশে দাঁড়াল। তারপর রবোটের মত গলায় বলল, "ম-হ-ব-ব-ট জা-ন-ই-শ-কু-ল-কী-ফা-নি-হা-হা-হা।"

শুধু তাই না তারপর আমাদের প্রজেক্টগুলো দেখে ভান করল যে তার ব্রেনের সার্কিট উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে। রবোটের সাথে সাথে অক্সব্রীজ স্কুলের কয়েকটা ছাত্রছাত্রী ছিল। মিঠুন তাদের বলল, "এটা বিজ্ঞান মেলা। তোমরা একটা ক্লাউনকে রবোট সাজিয়ে এনেছ কেন? এটা কী বিজ্ঞান হয়েছে?"

ছেলেমেয়েগুলো নিশ্চয়ই মিঠুনকে আগে থেকে চিনে, একজন ইংরেজীতে বলল, "মিঠুন তুমি ভুলে গেছ আমরা সব সময় এটা করি। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্যে একটা ফান প্রজেক্ট করি। এটা সেই ফান প্রজেক্ট।"

আরেকজন বলল, "তোমার সেন্স অফ হিউমার চলে গেছে।"

সুন্দর টিস টসে একটা মেয়ে বলল, "তুমি যে স্কুলে গেছ সেখানে সেন্স অফ হিউমার তো অনেক পরের ব্যাপার কোনো সেন্সই তো থাকার কথা না।"

আরেকজন বলল, "তোমার কী এখন যথেষ্ট মহব্বত হয়েছে?" তারপর সবাই হি হি করে হাসতে লাগল।

মিঠুন মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল, ঝুম্পা বলল,"মিঠুন, দিব একটা রদ্দা? জন্মের মতো বাপের নাম ভুলিয়ে দিব?"

মিঠুন মাথা নাড়ল বলল, "না, না খবরদার।"

বিকেলবেলা আমরা যখন প্রজেক্টগুলো গুছিয়ে ফিরে যাচ্ছি তখন মিঠুনকে খুবই মনমরা দেখা গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

মিঠুন একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে বলল, "নাহ্ কিছু না।"

আমি বললাম, "তুই খামোখা সায়েন্সের প্রজেক্টগুলো করেছিস। কেউ সায়েন্স প্রজেক্ট দেখতে চায় না– ঠাট্টা তামাশা দেখতে চায়। অক্সব্রীজ স্কুলের

মত আমাদের রবোট ফবোট বানানো উচিত ছিল।"

ঝুম্পা বলল, "এখনো সময় চলে যায় নাই। কাল পরশু সময় আছে।"

বগা বলল, "এতো কম সময়ে নূতন কিছু করা যাবে?"

আমি বললাম, আসল প্রজেক্ট করা যাবে না। কিন্তু ইয়ার্কী মার্কা প্রজেক্ট করতে সমস্যা কী?"

মিঠুন চোখ কপালে তুলে বলল, "ইয়ার্কী মার্কা? ইয়ার্কী মার্কা সায়েন্স প্রজেক্ট হয় নাকি?"

আমি বললাম, হয় একশবার হয়।"

কাজেই পরের দিন আমরা আগের প্রজেক্টগুলো পাল্টে ফেললাম। সবগুলো ফাটাফাটি প্রজেক্ট—প্রথম দিকে গাইগুঁই করলেও শেষে মিঠুন আমাদের একটু সাহায্য করল বলে এগুলো শুধু ইয়ারকী মার্কা থাকল না– এর মাঝে বেশ ভালো মতন সায়েন্স পর্যন্ত ঢুকে গেল।

যেমন ধরা যাক অদৃশ্য কালির প্রজেক্ট। সিরিঞ্জের ভিতর টকটকে লাল রং কেউ এলেই তার গায়ে ছিটিয়ে দেয়া হয়। যার গায়ে ছিটিয়ে দেয়া হয় সে প্রথমে খুব রেগে ওঠে, রাগটা বাড়াবাড়ি হতেই হঠাৎ করে রংটা অদৃশ্য হয়ে যায়। এটা মিঠুন তৈরী করে দিয়েছে–সে বলেছে এটা নাকী ছেলেমানুষী প্রজেক্ট কিন্তু দেখা গেল মোটেও ছেলেমানুষী না, এটা পাবলিক খুব পছন্দ করছে।

এই প্রজেক্টটা আমরা একশগুণ মজাদার করে ফেললাম। দোকান থেকে সত্যিকারের লাল কালি এনে অন্য আরেকটা সিরিঞ্জে ভর্তি করে এনে রেখে দিয়েছি। যখন অক্সব্রীজ স্কুলের কোনো ছেলেমেয়ে আমাদের প্রজেক্ট দেখতে আসে আমরা অদৃশ্য কালির সিরিঞ্জটা সরিয়ে আসল লাল কালির সিরিঞ্জটা রেখে দিই। তারা নিজেদের ধবধবে সাদা শার্টে সেই রং লাগায় সেই রং আর উঠে না। পাকা রং ছয় মাসেও উঠবে না। সেটা নিয়ে আমাদের সাথে ঝগড়া করে তারা সুবিধা করতে পারে না কারণ ঝগড়াঝাটি মারপিটে আমাদের সাথে কেউ কোনোদিন পারবে না।

আমাদের দুই নম্বর প্রজেক্টটাও খুবই মজার। একটা বিশাল গামলার মাঝে গ্লিসারিন মেশানো সাবানগোলা পানি, তার মাঝে একটা বড় রিং। গামলাতে দাঁড়িয়ে রিংটা ওপরে তুলেই আস্ত মানুষটা একটা বিশাল সাবানের বুদবুদের ঢুকে যায়। মিঠুন আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে কতোখানি সাবান

গোলা পানিতে কতোখানি গ্লিসারিন মিশাতে হবে আমরা সেটা তৈরি করে যাচ্ছি আর ছেলে মেয়েরা নিজের শরীরের সমান সাবানের বুদবুদ তৈরি করে যাচ্ছে।

এটাও আরো বেশী মজার এক্সপেরিমেন্ট করে ফেলেছি। অক্সব্রীজ স্কুলের কোনো ছেলেমেয়ে এলেই আমরা সাবানগোলা পানি গামলার ঢালার ভান করে তাদের শরীরে ঢেলে দিই।

তবে সবচেয়ে ফাটাফাটি হয়েছে যে প্রজেক্ট তার নাম ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টেমুলেটর। নামটা খুবই কঠিন আমরা কেউ সেটা উচ্চারণ করতে পারি না, তাই বড় কাগজে সেটা লিখে টানিয়ে রেখেছি। এই প্রজেক্টটা করতে আমাদের গুললুকে আনতে হয়েছে। সে প্রথমে আসতে রাজী হয়নি। শেষে দিনে একশ টাকা আর প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় খেতে দিব বলে তাকে শেষ পর্যন্ত আনা গেছে।

প্রজেক্টটার বর্ণনা দেবার জন্যে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি, একটা চেয়ারে গুললু বসে থাকে। তার মাথায় আমরা কয়েকটা তার লাগিয়ে রেখেছি। সেই তারগুলো এসেছে একটা বাক্সে। বাক্সটার ওপরে কয়েকটা সুইচ কয়েকটা নব আর কয়েকটা বাতি জ্বলতে নিভতে থাকে। সামনে যখন বেশ কয়জন দর্শক হাজির হয় তখন আমরা বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলি, "এই যন্ত্রটা সরাসরি এই ছেলেটার মস্তিষ্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। আমরা এই সুইচগুলো দিয়ে আর এই নবগুলো দিয়ে এই ছেলেটার মনের ভাব কন্ট্রোল করতে পারি।"

আমরা তখন সুইচটা অন অফ করে বলি, "এখন তার মস্তিষ্কে হাসির অনুভূতি দিয়েছি।"

গুললু তখন হা হা করে হাসে। তার সেই বিকট হাসি শুনে মানুষ থতমত খেয়ে যায়। তখন আমরা আবার সুইচ অন অফ করে বলি, "এখন আমরা এই ছেলেটার ভিতরে দুঃখের অনুভূতি দিচ্ছি।"

গুললু তখন বুক চাপড়ে হাউ মাউ করে কান্নার ভঙ্গী করে, সেটা দেখে তাকে ঘিরে থাকা পাবলিক আনন্দে হাততালি দেয়। তখন আমরা সবচেয়ে মজার অংশটা করি, আমরা বাক্সটায় সুইচগুলি আরো কয়েকবার অন অফ করে নবগুলো ঘুরাই তারপর বলি, "এখন সবাই সাবধান, কারণ এখন আমরা ছেলেটার ভিতরে রাগের অনুভূতি দিচ্ছি।"

তখন গুললু হঠাৎ চিৎকার করে উঠে, টান দিয়ে সার্ট ছিঁড়ে ফেলে, টেবিলে থাবা দেয়, লাফিয়ে কুঁদিয়ে জিনিষপত্র ভেঙ্গে একটা তুলকালাম কাণ্ড

করে ফেলে। গুললুর সারা শরীর স্টীলের তৈরি, সে থাবা দিয়ে ইটের টুকরা গুড়া করে ফেলতে পারে। কাজেই তার রাগের অভিনয়টা এতো ভয়ংকর হয় যে সব মানুষজন হতবাক হয়ে যায়। হলের যত দর্শক তারা সবকিছু ছেড়ে গুললুর লাফঝাঁপ দেখতে চলে আসে।

লাফঝাঁপ দেওয়ার সময় যদি অক্ষব্রীজ স্কুলের ছেলেমেয়ে চলে আসে তাহলে তার কপালে অনেক দুঃখ থাকে। গুললু তাকে ধাওয়া করে, হুংকার দিয়ে তার পিলে চমকিয়ে দেয়।

আমাদের এই নূতন সায়েন্স প্রজেক্ট গুলো দেখার জন্যে সবাই আমাদের কাছে চলে আসতে শুরু করল। অক্ষব্রীজ স্কুলের ছেলেমেয়েরা শুকনো মুখে বসে থাকে। রবোট বেচারাকেও আজকে আর কেউ দেখতে চায় না। সে তার মাথাটা খুলে হাতে মনমরা হয়ে নিয়ে একটা চেয়ারে বসে থাকে, কেউ তার দিকে ঘুরেও তাকায় না।

বিজ্ঞান মেলা পুরোপুরি দখল করেই আমরা শান্ত হলাম না। অক্ষব্রীজ স্কুলকেও একটা শিক্ষা দিয়ে দেয়া হল। ব্যাপারটা ঘটল এভাবে, ঝুম্পা প্রথমে গেল অক্ষব্রীজ স্কুলের প্রজেক্ট দেখতে। ছেলেমেয়েগুলো যখনই কথা বলতে শুরু করেছে তখন কথার মাঝখানে হঠাৎ করে ঝুম্পা জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের স্কুলের নাম হচ্ছে অক্ষব্রীজ। অক্ষ মানে ষাঁড়। তোমরা ষাঁড়ের নাম দিয়ে স্কুলের নাম রেখেছ কেন?"

ছেলেমেয়েগুলো থতমত খেয়ে কিছু একটা বলতে শুরু করতেই ঝুম্পা তাদের থামিয়ে বলে, "তার মানে তোমরা ষাঁড়ের স্কুল? তোমাদের ছাত্রছাত্রী হচ্ছে ষাঁড় আর গরু?"

ছেলেমেয়েগুলো তখন খুব রেগে ইংরেজীতে গালাগাল দিতে শুরু করেতই ঝুম্পা গরুর মতো করে ডাকলো, "হাম্বা-হাম্বা!" তারপর চলে এল।

এরপর আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েরাও একজন একজন করে অক্ষব্রীজ স্কুলের প্রজেক্ট দেখতে গেল আর তারা কথা শুরু করতেই আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েরা গরুর মত করে ডাকতে শুরু করল, "হাম্বা-হাম্বা—"

তখন যা একটা মজা হল সেটা বলার মত না। শুধু যে আমরা অক্ষব্রীজ স্কুলের ছেলেমেয়েদেরকে হাম্বা করে ডাকতে লাগলাম তা নয়, বিজ্ঞান মেলার অন্যান্য স্কুলের ছেলেমেয়েরাও তাদের দেখে গরুর মত হাম্বা হাম্বা করে ডাকতে লাগল। আমরা যেরকম অক্ষব্রীজ স্কুলের ছেলেমেয়েদের দেখতে পারি না সেরকম মনে হয় অন্য স্কুলের ছেলেমেয়েরাও অক্ষব্রীজ

স্কুলকে দেখতে পারে না। আমরা তাদের সবাই মিলে এতই জ্বালাতন করলাম যে তখন তাদের একজন টিচার তাদের কয়েকজন ছাত্রছাত্রীদেকে নিয়ে আমাদের কাছে এল, আমরা দেখলাম এটা সেই সায়েন্স টিচার।

মিঠুনের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "মিঠুন তোমাদের টিচাররা কোথায়?"

মিঠুন উত্তর দেবার আগেই ঝুম্পা উত্তর দিল, "আমাদের কোনো টিচার আসে নাই।"

সায়েন্স টিচার তখন মিঠুনকে বললেন, "যেহেতু তোমাদের স্কুলের কোনো টিচার নেই তাহলে আমি তোমাকেই বলি। তোমরা যেটা শুরু করেছ সেটা মোটেও গ্রহণযোগ্য কাজ না।"

কথাটা সত্যি। তাই আমরা চুপ করে রইলাম।

"স্যায়েন্স ফেয়ারে সায়েন্স প্রজেক্ট নিয়ে আসার কথা। তোমরা সেরকম প্রজেক্ট আননি। তোমরা কিছু তামাশা নিয়ে এসেছ। সারাদিন ধরে তামাশা করে বেড়াচ্ছ। আমি তোমাদের নামে কমপ্লেন করব যেন ভবিষ্যতে তোমাদের আসতে না দেয়।"

কথাগুলো সত্যি তাই আমরা চুপ করে থাকলাম। সায়েন্স টিচার বললেন, "মিঠুন, তুমি যতদিন আমাদের স্কুলে ছিলে আমরা তোমার সায়েন্স প্রজেক্ট দাড়া করাতে সাহায্য করেছি। অন্যান্য বছর অক্সব্রীজ স্কুলের পক্ষ থেকে তুমি চ্যাম্পিয়ান হয়ে পুরস্কার এনেছ। এখন দেখো তোমার অবস্থা। তুমি কি করছ? কিছু বেয়াদপ ছেলেমেয়ে নিয়ে হাম্বা হাম্বা করে বেড়াচ্ছ। ছিঃ মিঠুন ছিঃ। আমি খুবই দুঃখিত হলাম।"

কথাগুলো সত্যি কিন্তু চুপ করে থাকা কঠিন। তারপরেও চুপ করে রইলাম আর দেখতে পেলাম মিঠুনের মুখটা লজ্জায় কেমন যেন কালো হয়ে গেল।

সায়েন্স টিচার এখানেই থামলেন না, বলতে থাকলেন, "কালকে বড় বড় ইউনিভার্সিটির বড় বড় প্রফেসররা প্রজেক্টগুলো দেখতে আসবে। তারা কী তোমাদের তামাশা প্রজেক্টকে কোনো গুরুত্ব দেবে? না, দেবে না। তুমি কিংবা তোমার স্কুল কোনো পুরস্কার পাবে না। কোন স্কুল চ্যাম্পিয়ন হবে? আমাদের স্কুল। তার কারণ আমাদের স্কুলের প্রজেক্ট হচ্ছে সত্যিকারের প্রজেক্ট। আমরা তৈরি করেছি ভ্যান ডি গ্রাফ জেনারেটর। সোলার পাওয়ার্ড কার। সিনথেসিস অফ ডিজেল অয়েল। বুঝেছ মিঠুন, ভেবেছিলাম তুমি

একদিন সত্যিকারের সায়েন্টিস্ট হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমার ধারণা ভুল। তুমি আসলে সায়েন্টিস্ট হবে না। তুমি কিছু বেয়াদপ ছেলেমেয়েদের সাথে থেকে বেয়াদপ একজন মানুষ হয়ে বড় হবে। তুমি আর তোমার বন্ধুরা এসে সায়েন্স ফেয়ারের মতো সুন্দর একটা পরিবেশকে নষ্ট করে দিবে।"

কথাগুলো সত্যি তাই আমরা চুপ করে রইলাম।

স্যায়েন্স টিচার বললেন, "তুমি যখন আমাদের স্কুলে ছিলে তখন তোমাকে নিয়ে আমরা গর্ব করতাম। আজকে তোমাকে নিয়ে আমি লজ্জা পেলাম।"

স্যায়েন্স টিচার চলে যাবার পর মিঠুন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ঝুম্পা বলল, "কতো বড় সাহস। আমাদের স্যার ম্যাডামেরা আমাদের সাথে কথা বলতে সাহস পায় না। আর অন্য স্কুল থেকে একজন মাস্টার এসে আমাদের বকে যাবে? কতো বড় সাহস?"

বগা বলল, "গুললুকে বলি ওদের প্রজেক্ট গুড়ো করে দিয়ে আসুক।"

মিঠুন মাথা নাড়ল, বলল, "না না। খবরদার। তাছাড়া—"

"তাছাড়া কী?"

"স্যার তো ভুল বলেননি। সত্যি কথাই বলেছেন। ওদের প্রজেক্ট কতো ভালো। নিশ্চয়ই কয়েক মাস থেকে কাজ করেছে, স্যারেরা সাহায্য করেছে। প্রজেক্টের পিছনে হাজার হাজার টাকা খরচ করেছে। আসলেই তো আমরা কোনো পুরস্কার পাব না। আমাদের প্রজেক্টগুলো তো আসলেই তামাশা।"

বিকেল বেলা আমরা যখন ফিরে যাচ্ছি তখন আমি নিচু গলায় মিঠুনকে বললাম, "মিঠুন।"

মিঠুন বলল "কী?"

"তুই আসলেই বিজ্ঞান মেলায় চ্যাম্পিয়ন হতে চাস?"

"হতে চাইলেই কী হওয়া যায়? তার জন্যে পরিশ্রম করতে হয়।"

আমি ফিস ফিস করে বললাম, "তোর ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা নিয়ে আয়, তুই চ্যাম্পিয়ান হয়ে যাবি।"

"ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা"?

"হ্যাঁ।"

কাজেই পরের দিন সবাই প্রথমবার ব্ল্যাকহোলের বাচ্চাকে দেখতে পেল।

আমার মনে আছে আমাদের বাসার চিলেকোঠায় মিঠুন কতো সহজে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা থেকে লকলকে জিবের মতোন প্লাজমা বের করে ফেলেছিল, তাই আমি ভেবেছিলাম সে বুঝি খুব সহজেই বিজ্ঞান মেলায় সেটা করতে পারবে। কিন্তু বেশ অবাক হলাম যখন দেখলাম তার প্রজেক্টটা দাড়া করাতে অনেক সময় লাগল। আগের রাত একেবারে বারোটা পর্যন্ত কাজ করতে হলো। পরের দিন সকালেও তার কাজ করতে হল, শেষ পর্যন্ত যখন বিজ্ঞান মেলায় সেটা দেখার জন্যে রেডি হল আমি সেটা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এর ভেতরে পুরান টিভির যন্ত্রপাতি, কম্পিউটারের ড্রাইভের চুম্বক, প্রিন্টারের রোলার, এলার্ম ক্লাকের মোটর– এক কথায় এমন কোনো যন্ত্র নেই যেটা সেখানে নেই! আমি অবাক হয়ে বললাম, "আরে! এটা কী তৈরী করেছিস? এতো যন্ত্রপাতি কেন?" মিঠুন গলা নামিয়ে বলল, "এইখানে যা আছে তার বেশিরভাগ ভূয়া।"

"ভূয়া?"

"হ্যাঁ। এইগুলো লাগিয়ে দিয়েছি যেন কেউ আসল ব্যাপারটা বুঝতে না পারে।"

"আসল ব্যাপার?"

"হ্যাঁ, আমি সবাইকে বোঝাব খুব হাই ভোল্টেজ দিয়ে প্লাজমা তৈরী হয়।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম "বুঝতে পারলাম। তুই কাউকেই আসল জিনিসটা বলতে চাস না?"

"না। আসল জিনিসটা জানলে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে!"

সকালবেলা মিঠুনের জটিল যন্ত্র নিয়ে আমরা বিজ্ঞান মেলায় হাজির হলাম। টেবিলের উপর রেখে একবার সেটা পরীক্ষা করে দেখা হল। সুইচ টেপা মাত্রই এটা ভোতা শব্দ করতে লাগল। মিঠুন সাবধানে নবটা ঘুরিয়ে

ব্ল্যাকহোলের বাচ্চার দুই পাশে ভোল্টেজটা বাড়ানো মাত্রই হঠাৎ ছোট বিস্ফোরণের মতো একটা শব্দ হলো আর শিশিটার ছোট মুখ থেকে একটা আগুনের তৈরী সাপের মতো বিশাল একটা শিখা হিস হিস করে বের হয়ে এল। আবছা নীল রংয়ের এই সাপটা দুলতে থাকে। দুলতে দুলতে জীবন্ত প্রাণীর মতো প্লাজমার তৈরী এই সাপটা ছাদটাকে আঘাত করতে থাকে। ছাদ থেকে পোড়া প্যালেস্তারা ঝুরঝুর করে নিচে পড়তে থাকে আর পুরো টেবিলটা থর থর করে কাঁপতে থাকে। প্লাজমাটার একটা আশ্চর্য শব্দ হয় আর সাথে সাথে সারাঘর বিচিত্র একটা ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে গেল। সবকিছু ঠিক ঠিক কাজ করছে দেখার পর মিঠুন তার নবটা ঘুরিয়ে ভোল্টেজ কমিয়ে আনতেই প্লাজমার জ্বলন্ত শিখাটা সাথে সাথে সর সর করে শিশির ভেতরে ঢুকে গেল।

এই বিচিত্র ব্যাপারটা দেখার জন্যে মুহূর্তের মাঝে চারপাশে ভীড় জমে গেল। লোকজন ছেলে-পিলে অবাক হয়ে বলল, "কী এটা কী?"

মিঠুন বলল, "হাইপ্রেশার প্লাজমা জেনারেটর।"

তার অর্থ কী কেউ বুঝতে পারল না কিন্তু সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না,বলল, "দেখাও। আবার দেখাও।"

মিঠুন একটু ইতস্তত করল,বলল, "সবাইকে তাহলে দূরে সরে যেতে হবে। এটা অনেক পাওয়ারফুল— হঠাৎ করে কারো গায়ে লেগে গেলে বিপদ হবে।"

আমরা কয়েকজন মিলে সবাইকে ঠেলে একটু দূরে সরিয়ে দিলাম। মিঠুন আবার সুইচ অন করে ভোল্টেজের নবটা ঘুরাতে থাকে, প্রথমে একটু ভোঁতা শব্দ শোনা গেল হঠাৎ ছোট একটা বিস্ফোরণের মত শব্দ করে সাপের মত লকলকে একটা প্লাজমার শিখা বের হয়ে আসে। সেটা জীবন্ত প্রাণীর মত কিলবিল করে নড়তে থাকে। আশেপাশে একটা বিচিত্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। যারা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল তারা বিস্ময়ের এবং ভয়ের শব্দ করে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

কয়েক সেকেন্ড দেখিয়েই মিঠুন তার হাইপ্রেশার প্লাজমা বন্ধ করে দিল। সবাই তখন ভীড় করে যন্ত্রটা দেখতে এল এবং আমার মনে হলো মিঠুন নানারকম ভূয়া যন্ত্রপাতি দিয়ে যন্ত্রটাকে জটিল করে বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছে। যদি সবাই দেখত ছোট একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশি থেকে এই ভয়ঙ্কর প্লাজমা বের হয়ে আসছে তাহলে তারা নিশ্চয়ই এতো চমৎকৃত হত না।

মিঠুনের হাই-প্রেশার প্লাজমা দেখার জন্যে মানুষ ভীড় করতে থাকে। তাকে একটু পরে পরে সেটা দেখাতে হয়। আমি গলা নামিয়ে বললাম, "এতবার দেখাস না, হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেলে বিপদ হবে। বিচারকদের আগে ভালো করে দেখিয়ে নে।"

মিঠুন ফিসফিস করে বলল, "দেখানো নিয়ে সমস্যা নাই। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"কিন্তু বোঝাব কেমন করে? ব্ল্যাকহোলের বাচ্চার কথা তো বলা যাবে না—"

আমি মিঠুনকে সাহস দিলাম "বোঝাবুঝির কী আছে? জিনিসটা দেখবে। দেখলেই তো হলো।"

মিঠুনকে তারপরেও কেমন যেন নার্ভাস দেখাল। সে কেন নার্ভাস ছিল সেটা আমি একটু পরেই বুঝতে পারলাম। বিচারকেরা সবার প্রজেক্ট দেখতে দেখতে এগিয়ে আসছেন, তারা এর মাঝেই মিঠুনের হাই-প্রেশার প্লাজমা প্রজেক্টের খবর পেয়েছেন তাই ছোটখাটো প্রজেক্টে সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি মিঠুনের কাছে চলে এলেন।

বিচারকদের দলে তিনজন মানুষ, একজন একটু কম বয়সী অন্য দুইজন মাঝবয়সী, তাদের চুলে পাক ধরেছে, চোখে চশমা। দুজনেই ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, তাদের সাথে আরো উৎসাহী লোকজন আছে, আমি দেখলাম অক্সব্রীজ স্কুলের সায়েন্স টিচারও পিছন পিছন এসেছেন। মাঝবয়সী একজন প্রফেসর গম্ভীর গলায় বললেন, "এটা কী?"

মিঠুন কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, "হাই-প্রেশার প্লাজমা।"

"হাই-প্রেশার?"

"আসলে সবাই লো প্রেশারে প্লাজমা তৈরী করে। এটা যেহেতু এটমস্ফিয়ারিক প্রেশারে তৈরী হয়েছে সে জন্যে বলছি হাই-প্রেশার। আসলে বলা উচিত ছিল এটমস্ফিয়ারিক প্লাজমা।"

মাঝবয়সী প্রফেসর বললেন, "সমস্যা নাই। নামে কী আসে যায়? দেখাও এটা কী করে।"

মিঠুন কাঁপা হাতে সুইচ অন করে নবটা ঘোরালো, সাথে সাথে ছোট একটা বিস্ফোরণের মত শব্দ করে লকলক করে প্লাজমাটা বের হয়ে হিসহিস শব্দ করে জীবন্ত একটা প্রাণীর মত ছাদকে স্পর্শ করল। প্লাজমা থেকে নীলাভ আলোটা সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে আর বিচারকেরা ভয় পেয়ে দুই পা

পিছিয়ে গেলেন। তারা হতভম্বের মত সেটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। একজন চাপা গলায় বললেন, "ও মাই গড!"

আরেকজন বললেন, "এটা কীভাবে সম্ভব?"

প্রথমজন মিঠুনকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা তু-তুমি বানিয়েছ?"

"আমি একা না। আমরা বন্ধুরা মিলে বানিয়েছি।"

আমি একটু নড়ে চড়ে দাঁড়ালাম, চুল ঠিক করলাম, ছোট করে কাশলাম যেন সবাই বুঝতে পারে মিঠুন যেসব বন্ধুর কথা বলেছে আমি তাদের একজন।

কমবয়সী বিচারক জিজ্ঞেস করল, "এটা কীভাবে কাজ করে?"

মিঠুন বলল, "হাইভোল্টেজ দিয়ে বাতাসকে আয়োনাইজ করে ফেলি।"

"কত হাইভোল্টেজ দাও?"

"পুরান টেলিভিশনের ফ্লাই হুইল ব্যবহার করেছি— তার মানে কয়েক হাজার ভোল্ট।"

মধ্যবয়স্ক প্রফেসর বললেন, "কয়েক হাজার ভোল্টে এরকম প্লাজমা তৈরী হয় না।"

মিঠুন একটু ঢোক গিলে বলল, "শুধু হাই ভোল্টেজ দিই না স্যার আরো কিছু ব্যবস্থা করেছি।"

"কী করেছ?"

"প্রথমে একটা ফিলামেন্ট বেরিয়াম অক্সাইড দিয়ে কোট করেছি (মিথ্যা কথা), সেটাকে স্যার কারেন্ট দিয়ে গরম করি (ভূয়া তথ্য), ফিলামেন্ট গরম হলে ইলেকট্রন এমিট করে (তথ্যটা সত্যি হতে পারে— এখানে করা হয় নাই), সেই ইলেকট্রন কাছাকাছি বাতাসকে আয়োনাইজ করে (সম্ভব কিনা কে বলবে?), তখন একটা হীটার বাতাসকে প্রি-হিট করে (পরিষ্কার মিথ্যা কথা), একটা ফ্যান সেই বাতাসকে ব্লো করে (ছোট একটা ফ্যান আছে শুধু সাউন্ড এফেক্টের জন্যে), প্রিহিটি বাতাস অনেকগুলো হাইভোল্টেজ গ্রীডের ভিতর দিয়ে যায় (ভূয়া ভূয়া চরম ভূয়া) তখন প্লাজমাটা তৈরী হয়।"

মিঠুন কোনো প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ না দিয়ে টানা কথা বলে গেল, আমি মিঠুনের এরকম বৈজ্ঞানিক ভূয়া কথা বলার ক্ষমতা দেখে চমৎকৃত হলাম। ভেবেছিলাম এরকম বৈজ্ঞানিক কথা শুনে বিচারক তিনজন বুঝি

সন্তুষ্ট হবে, কিন্তু মাঝবয়সী প্রফেসরদের একজন পুরোপুরি সন্তুষ্ট হলেন না। মাথা চুলকে বললেন, "তুমি যেভাবে বলেছ সেভাবে তো এরকম ভায়োলেন্ট প্লাজমা হবার কথা! ছোটখাটো স্পার্ক হতে পারে— কিন্তু তাই বলে ছয়-সাতফুট লম্বা এরকম বিশাল প্লাজমা তাও এটমস্ফিয়ারিক প্রেসারে— ইম্পসিবল।"

মিঠুন বলল, "কিন্তু স্যার, আপনি তো দেখছেন— এটা হচ্ছে! আপনার চোখের সামনে হচ্ছে। যদি সম্ভব হত তাহলে পুরোটা খুলে দেখাতাম স্যার!"

বিচারকরা মাথা চুলকালেন। মিঠুন বলল, "শুধু একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি।"

"কী জিনিস?"

"বাতাসটাকে যে চেম্বারে প্রিহিট করি সেই চেম্বারের ভিতরে একটা জিনিসের প্রলেপ দিয়েছি। মনে হয় সেই জিনিসটার জন্যে এত সহজে বাতাসের অনু পরমাণু আয়োনাইজ করা হয়।"

তিনজনই এবার আগ্রহী হল, "কী জিনিস"

"অনেক ট্রায়াল এন্ড এরর করে বের করেছি স্যার। এর মাঝে ঠিক কী আছে পরিষ্কার করে জানি না। যদি এটমিক মাস স্পেক্‌টাম এনালাইজার থাকত বলতে পারতাম।"

মাঝ বয়সী প্রফেসর বললেন, "ভেরি স্ট্রেঞ্জ।"

অন্যজন বললেন, "কিন্তু নিজের চোখে দেখছি। অবিশ্বাস করি কী করে?"

প্রথমজন বললেন, "এটা অবশ্যি খুবই বিপজ্জনক। এই প্লাজমা নড়তে চড়তে গিয়ে যদি কারো শরীরে লাগে তাহলে মেজর একসিডেন্ট হবে।"

মিঠুন বলল, "আপনারা দেখার পর বন্ধ করে রাখব স্যার।"

"সেটাই ভালো।"

তারপর তারা তাদের হাতে লেখা কাগজটাতে প্রজেক্টের মার্কস লিখে হাঁটিতে শুরু করল। কতো দিয়েছে দেখার জন্য আমি ইতি উতি চেষ্টা করলাম, লাভ হল না। তারা যখন হাঁটছে আমি পিছু পিছু গেলাম, শুনলাম একজন আরেকজনকে বলছে, "আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।"

অন্যজন বলল, "আমি নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না। শুধু মাত্র এনার্জী কনজারভেশানের কথা ধর— এটমস্ফিয়ারিক প্রেশারে এ রকম ভায়োলেন্ট একটা প্লাজমা তৈরী করতে কী পরিমাণ এনার্জী লাগবে কল্পনা করতে পার? সেই এনার্জীটা কোথা থেকে আসছে? পুরান টেলিভিশনের ফ্লাই ব্যাক সেটা দিতে পারে? অসম্ভব !"

"তাহলে?"

"সেটাই তো সমস্যা ! এই বাচ্চা এটা তৈরি করল কেমন করে?"

"তবে বাচ্চাটা কিন্তু জানে। তার কথাবার্তা বাচ্চাদের মত না, বড় মানুষের মত। সায়েন্স ফেয়ারটা শেষ হলে বাচ্চাটার যন্ত্রটাকে নিয়ে বসতে হবে। কীভাবে কাজ করে দেখতে হবে।"

"হ্যাঁ। আমার কেন জানি মনে হয়—"

"কী মনে হয়?"

"বাচ্চাটা যেটুকু বলেছে তার বাইরেও কিছু একটা আছে। সে আমাদের পুরোটুকু বলেনি।"

"তোমার তাই ধারণা?"

"হ্যাঁ। বাচ্চাটা তো বোকা না, সে সবকিছু জানে। সে যে আমাকে বলেনি তারও নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে।"

"কী কারণ?"

প্রফেসর মানুষটি তখন গলা নামিয়ে কথা বলতে লাগল, তাই আমি আর তাদের কথাগুলো শুনতে পেলাম না। যেটুকু শুনেছি সেটাই যথেষ্ট। আমি প্রায় দৌড়ে মিঠুনের কাছে এলাম। তার হাই প্রেশার প্লাজমা ঘিরে শত শত মানুষ গিজ গিজ করছে। সবাই দেখতে চাইছে। বগা, গুললু, ঝুম্পা মিলে সবাইকে ঠেলে সরিয়ে জায়গা করে দিচ্ছে আর মিঠুন তখন তার যন্ত্র চালু করছে। বিস্ফোরণের মত শব্দ করে লকলকে প্লাজমা ছাদ পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে। কাছাকাছি অক্সব্রীজ স্কুলের প্রজেক্টের সামনে কেউ নেই, তারা গালে হাত দিয়ে শুকনো মুখে বসে আছে।

আমি মিঠুনের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম, "মিঠুন—"

"কী হয়েছে?"

"বিচারক প্রফেসররা টের পেয়ে গেছে—"

"কী টের পেয়েছে?"

"এখানে আসলে অন্য কিছু আছে, তুই তাদের পুরোটা বলিসনি।

গোপন করেছিস।"

মিঠুন আমার কথা শুনে অবাক হল না, বলল, "টের পেতেই পারে। যে কোনো মানুষ যদি একটুখানি বিজ্ঞান জানে তাহলেই টের পেয়ে যাবে।"

আমি ফিসফিস করে বললাম, "সায়েন্স ফেয়ার শেষ হবার পর তারা যন্ত্রটা আবার দেখতে আসবে।"

"আসুক।" মিঠুন বলল, "আমি ততক্ষণে এটা খুলে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চাটাকে সরিয়ে দিব।"

বিচারকরা সবগুলো প্রজেক্ট দেখার পরই সায়েন্স ফেয়ার শেষ হয়ে গেল। সবাই নিজেদের যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিচ্ছে, তখন মিঠুনও সাবধানে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চাটাকে খুলে তার পকেটে ভরে নিল। সেই জায়গায় সে আরেকটা ছোট বোতল রেখে দিল। বোতলটা একেবারে খালি রাখলে কেমন দেখায়? কী রাখা যায় সেটা নিয়ে যখন চিন্তা করছে তখন আমি আমার মুখের ভিতর থেকে চিউয়িং গামটা বের করে মিঠুনকে দিলাম। "নে। এটা রেখে দে।"

মিঠুন এক সেকেন্ডের জন্যে হকচকিয়ে গেল তারপর বলল, "ঠিক আছে, দে! বোতলটার মাঝে রেখে দে।"

আমি তখন বোতলটার মাঝে চিউয়িং গামটা রেখে দিলাম।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অক্সব্রীজ স্কুলের ছেলেমেয়েরা মুখ কালো করে বসে থাকল। দর্শকদের ভেতর থেকে কেউ কেউ চাপা স্বরে হঠাৎ করে "হাম্বা" করে ডেকে উঠছিল সেটা শুনে তাদের মুখ আরো কালো হয়ে উঠল। হাই প্রেশার প্লাজমা প্রজেক্টটাকে যখন জুনিয়র গ্রুপের চ্যাম্পিওন ঘোষণা করা হল তখন কেউ অবাক হল না। আমরা তখন যেভাবে গর্জন করে উঠলাম সেটা এই শহরের মানুষ অনেকদিন মনে রাখবে। পুরস্কার নেওয়ার জন্যে মিঠুনের সাথে সাথে আমরাও স্টেজে উঠে গেলাম, পুরস্কারটা হাতে নেবার পর আমরা যেভাবে চেচাঁমেচি করলাম সেটা দেখে সবাই বুঝতে পারল আমরা এর আগে জীবনেও কোনোদিন কোনো পুরস্কার পাইনি—পুরস্কার পাবার পর কী করতে হয় সেটা আমাদেরকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি।

যখন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হচ্ছে তখন বিচারকদের একজন প্রফেসর দর্শক সারি থেকে উঠে গেলেন। আমি চোখের কোনা দিয়ে দেখলাম সেই প্রফেসর হল ঘরের দিকে যাচ্ছেন। সেখানে কোথায় যাচ্ছেন,

কেন যাচ্ছেন বুঝতে আমার কোনো সমস্যা হল না। সেদিন বিকালে হাই প্রেশার প্লাজমা যন্ত্রটা খুলে নেয়ার সময় আমরা দেখলাম সেখানে ছোট বোতলটা আছে কিন্তু তার ভেতরকার চিবিয়ে ছাতু করে রাখা চিউয়িংগামটা নাই!

আমাদের মহব্বতজান স্কুলের ইতিহাসে কখনো এসেম্বলী হয় না, কখনো জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না। পরের দিন এসেম্বলী হল, এমন কী ভুল সুরে কয়েকজন জাতীয় সংগীত পর্যন্ত গেয়ে ফেলল। তারপর আমাদের হেড স্যার কাঁপা গলায় বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন, "আমার ফ্রিয় ছেলে মেয়েরা (স্যার প্রিয় উচ্চারণ করতে পারেন না।) তোমরা সবাই শুনছ আমাদের হাজী মহব্বতজান উচ্চ বিদ্যালয় বিজ্ঞান মেলায় চ্যাম্পিওন হইছে। (আমরা চিৎকার করলাম লাফালাফি করলাম) আলহাজ মহব্বত জান স্যারের নেতৃত্বে এই ইস্কুল শুধু এই শহরের মইধ্যে না এই দেশের মইধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইস্কুল হয়া যাইব। (কথাটা পুরাপুরি মিথ্যা কিন্তু তারপরেও আমরা আবার একটু চিৎকার করলাম।) যখন কেলাশ এইটের ছেলে মেয়েরা আমার কাছে আইসা বলল তারা সায়েন্স ফেয়ারে যোগ দিতে চায় আমি সাথে সাথে সেই অনুমতি দিছি। (কত বড় বানোয়াট কথা!) শুধু অনুমতি না, আমি তাগো রিচার্সের জন্যে (শব্দটা নিশ্চয়ই রিসার্চ কিন্তু হেড স্যার রিসার্চ বলতে পারেন না, বলেন রিচার্স) দশ হাজার টাকা পর্যন্ত দিছি। (আমরা আবার চিৎকার করলাম) কেলাশ এইটের ছেলে মেয়েরা এই দশ হাজার টাকার মর্যাদা রাখছে, তারা পুরস্কার আনছে। এই স্কুলের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখছে। ..."

হেড স্যার অনেকক্ষণ ভ্যাদর ভ্যাদর করলেন। আমরা সবাই সহ্য করলাম। বক্তৃতার শেষে স্যার পুরস্কার পাওয়া উপলক্ষে একদিনের ছুটি ঘোষণা দিলেন।

সায়েন্স ফেয়ার শেষ হবার পর মহব্বতজান স্কুলে কয়েকটা পরিবর্তন হল। তার মাঝে একটা হল স্কুলের ল্যাবরেটরিরে একটা চাবি আমাদের পাকাপাকিভাবে দিয়ে দেয়া হল, আমরা যখন খুশী সেখানে যেতে পারি যতক্ষণ খুশী যেখানে থাকতে পারি। ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করছি এরকম ভান করে আমরা এখানে বসে প্রত্যেকদিন আড্ডা মারি কেউ কিছু বলে না।

আমাদের বিজ্ঞান স্যার কালাপাহাড় মিঠুনকে যথেষ্ট সম্মান দেওয়া শুরু করলেন। সবচেয়ে বিপদ হল যখন ক্লাশে এসে কালাপাহাড় স্যার মিঠুনকে বলতে শুরু করলেন, "এই মিঠুন, তুই ক্লাশটা পড়া আমার জরুরী একটা কাজ আছে।"

মিঠুন খুব উৎসাহ নিয়ে আমাদের বিজ্ঞান পড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু কয়েকদিনের মাঝেই আমরা আবিষ্কার করলাম সে ভালো বিজ্ঞান জানতে পারে কিন্তু সে মোটেও পড়াতে পারে না। সোজা জিনিষটা এমন জটিল করে বলে যে আমরা মাথা মুণ্ডু কিছু বুঝি না। আমরা যখন কিছু একটা বুঝি না সে তখন আরো রেগে উঠতে থাকে আর যখন সে রেগে উঠে তখন মিঠুনের কথা বার্তাও ওলট পালট হতে থাকে। মিঠুনের ওপর ভার দিয়ে বিজ্ঞান স্যার আজকাল বেশীর ভাগ সময়েই ক্লাশে আসা বন্ধ করে দিলেন। তখন মিঠুনকে নিয়ে সমস্যা আরো বেড়ে গেল। কেউ মিঠুনের কোনো কথা শুনতে রাজী হতো না—সবাই মিলে হই চই চেঁচামেচি করে মিঠুনকে নিয়ে টিটকারী মারতে শুরু করল। আমরা আগেও কোনো স্যার থেকে কিছু শিখতাম না এখনো মিঠুনের কাছ থেকে কিছু শিখি না তাই আমাদের জীবনের কোনো উনিশ বিশ হল না।

ক্লাশে আমাদের বিজ্ঞানের কোনো কিছু বোঝাতে না পারলেও মিঠুন ব্ল্যাক হোলের বাচ্চা নিয়ে তার গবেষণা কাজ ভালোই চালিয়ে গেল।

এনার্জি, মোমেনটাম, গ্রাভিটি, থ্রাস্ট, লিফট, সেন্টার অফ গ্রেভিটি এরকম অনেক কঠিন কঠিন শব্দ বলতে বলতে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা নিয়ে কাজ করতে থাকে। কী তৈরী করছে সেটা আমাদের পরিষ্কার করে বলে না, কিংবা কে জানে হয়তো বলেছে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়নি। তবে আমরা সেটা নিয়ে মাথা ঘামাই না, মিঠুনের উপর আমাদের অনেক ভরসা। সে যেটা বানাচ্ছে তার জন্যে মাঝে মধ্যে কিছু কেনাকাটা করতে হচ্ছে— হেড স্যার যে দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন আগে তার বিশেষ কিছু খরচ হয়নি। এখন সেখান থেকে টাকা ব্যবহার করে মিঠুন প্রায়ই এটা সেটা কেনে। ল্যাবরেটরির ভেতরের ভাঙ্গা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে—একদিন দেখলাম সিড়ির নিচে পড়ে থাকা ভাঙ্গা কিছু চেয়ার টেবিল টানাটানি করছে- সেগুলো দিয়ে কী করবে কে জানে! আমরা অবশ্যি বেশি মাথা ঘামালাম না, মিঠুন ভাঙ্গা চেয়ার টেবিলগুলো কোথায় নিতে চায় তার কাছ থেকে শুনে আমরা ধরাধরি করে সেখানে পৌঁছে দিলাম।

এর ঠিক দুইদিন পর ইংরেজি ক্লাশে মিঠুন আমার কাছে গলা নামিয়ে বলল, "ইবু। আজ সন্ধেবেলা তুই স্কুলে আসতে পারবি?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম "কেন?"

"আজকে আমি একটা জিনিষ পরীক্ষা করব।"

"কী পরীক্ষা করবি?"

"ব্ল্যাক হোলের বাচ্চা দিয়ে যেটা বানিয়েছি—"

"কী বানিয়েছিস?"

"তুই আসলেই দেখবি। এখন আর কাউকে কিছু বলছি না শুধু তুই আর আমি।"

মিঠুন যখন শুধু আমাকে ছাড়া আর কাউকে কিছু বলছে না তখন আমাকে তো আসতেই হয় তাই সন্ধেবেলা আমি চলে এলাম। আসার সময় দেখলাম বাবা অস্ট্রেলিয়ার সাথে ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলা দেখছে, আমি যখন বললাম, "বাবা একটা কাজে যাচ্ছি আসতে দেরী হতে পারে—"

বাবা সেটা শোনার চেষ্টাও করল না, হাত নেড়ে আমাকে বিদায় করে দিল। কোথায় যাচ্ছি কেন যাচ্ছি ফিরতে কেন দেরী হবে কিছুই জানতে চাইল না।

স্কুলে গিয়ে দেখি মিঠুন এর মাঝে চলে এসেছে। স্কুলের বারান্দায় বসে বসে

মশার কামড় খাচ্ছে। আমাকে দেখে বলল, "এসেছিস?"

"হ্যাঁ"।

"আয়"।

"কোথায়"?

মিঠুন কথা না বলে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে ল্যাবরেটরি ঘরে চাবি খুলে ঢুকল। বলল, "যে যন্ত্রটা বানিয়েছি সেটা আজকে জোড়া লাগাব, আলাদা আলাদাভাবে তৈরী হয়েছে— আজকে একত্র করা হবে।"

মিঠুন তখন পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ভাঁজ খুলে মেঝেতে রাখল—বলল, "এইটা হচ্ছে ডিজাইন।"

আমি ডিজাইনের মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। মিঠুন বলল, "আয় কাজ শুরু করি।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে।"

মিঠুন তখন কাজ শুরু করল। দুইটা ভাঙ্গা চেয়ার পেরেক দিয়ে ঠুকে জুড়ে দিল। চেয়ারের পাগুলো করাত দিয়ে কেটে সেখানে নানারকম যন্ত্রপাতি লাগাতে লাগল। ড্রিল মেশিন দিয়ে ফুটো করে বড় বড় স্ক্রু লাগাতে লাগল। অনেকগুলো টিউব বাঁকা করে লাগিয়ে দিল। মাঝখানে স্টীলের তৈরী ভারী একটা সিলিন্ডার লাগালো। সেখান থেকে অনেকগুলো তার বের হয়েছে সেই তারগুলো একটা প্যানেলের মাঝে লাগালো। প্যানেলটা চেয়ার দুটোর সামনে একটা কাঠের টুকরো দিয়ে লাগিয়ে নিল। চেয়ার দুটোর চারপাশে হার্ডবোর্ডের কয়েকটা পাখা লাগাল। দেখতে দেখতে পুরো জিনিষটা একটা জটিল যন্ত্রের মত দেখাতে থাকে, মনে হতে থাকে এটা বুঝি কোনো সায়েন্স ফিকশানের সিনেমা থেকে বের হয়ে এসেছে।

রাত দশটার দিকে আমি মিঠুনকে বললাম, "খিদে পেয়েছে।"

মিঠুন বলল, "ঠিক বলেছিস। আয় খাই।"

"কী খাবি?"

"বাসা থেকে খাবার নিয়ে এসেছি।" বলে মিঠুন তার ব্যাগ থেকে নানা রকম খাবারের বাক্স বের করতে থাকে। পরটা, কাবাব, মিষ্টি, আপেল, দই এবং ফ্লাক্সে গরম চা। এতো খাবার যে আমরা দুজনে মিলে খেয়ে শেষ করতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, "তুই প্রত্যেকদিন এভাবে খাস? তাহলে তো হাতীর মত মোটা হয়ে যাবি।"

মিঠুন বলল, "না। প্রত্যেক দিন খাই না। আজকে বিশেষ দিন

সেইজন্যে খাচ্ছি।"

"আজকে বিশেষ দিন কেন?"

"আজকে এই স্পেশাল ফ্লাইং মেশিনটা উড়াব সেই জন্যে স্পেশাল খাবার।"

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "ফ্লাইং মেশিন? এটা ফ্লাইং মেশিন? এটা উড়বে?"

"হ্যাঁ।"

"ঘরের ভেতর কেমন করে উড়বে?"

"ঘরের ভেতর উড়বে না গাধা। আমরা এখন এটা বাইরে নিয়ে যা'ব।"

তখন মিঠুন আর আমি ধরাধরি করে এই জটিল যন্ত্রটা ঘরের বাইরে নিয়ে গেলাম। দোতলাটা পুরো শেষ হয়নি। বিশাল অংশ খোলা ছাদ। বিল্ডিংয়ের চারপাশে বড় বড় গাছ সেই ছাদটাকে ঘিরে রেখেছে তাই বাইরে থেকে এই জায়গাটা দেখা যায় না।

মিঠুন তার ফ্লাইং মেশিনটাকে ছাদের মাঝখানে রাখল। আবছা অন্ধকারে এটাকে কেমন যেন রহস্যময় দেখাতে থাকে। মিঠুন তখন তার ব্যাগ থেকে একটা লাইট বের করে তার কাপালে বেঁধে ফেলল। সেখানে একটা সুইচ টিপে দিতেই আলোটা জ্বলে উঠে এবং মিঠুনকে তখন একজন মহাকাশচারীর মত দেখাতে থাকে।

মিঠুন আরেকটা লাইট বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, "নে এটা তোর মাথায় বেঁধে নে। অন্ধকারে প্যানেলটা দেখতে পাবি।"

অন্ধকারে প্যানেলটা আমার কেন দেখতে হবে আমি সেটা আর জিজ্ঞেস করলাম না, মিঠুনের কথা মত মাথায় বেঁধে নিলাম। মিঠুন বলল, "আয় উঠি।"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম,"আগে একটু পরীক্ষা করে দেখলে হয় না এটা ঠিকমত কাজ করে কী না?"

"সেটাই তো করতে যাচ্ছি।"

"তাহলে উঠতে হবে কেন? না উঠে পরীক্ষা করা যায় না?"

"আর যখন এটা উড়ে চলে যাবে তখন কী করে নামাব?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "ইয়ে, মানে—"

মিঠুন বলল, "ও! তুই ভয় পাচ্ছিস? ভয় পেলে থাক, উঠতে হবে

না।"

ভীতু বলে অপবাদ দেয়ার পর তো আর পেছানো যায় না। বললাম, "ভয় পাব কেন? ভয় পাবার কী আছে?"

তারপর মিঠুনের ফ্লাইং মেশিনে উঠে বসলাম। মিঠুনও অন্যদিক দিয়ে উঠে বসে। ব্যাগটা পায়ের কাছে রেখে সেখান থেকে দুটো বেল্ট বের করে আনে। একটা আমার হাতে দিয়ে বলল, "বেঁধে নে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম "কী বেঁধে নেব?"

"নিজেকে চেয়ারের সাথে বেঁধে নে, সিট বেল্টের মতন।"

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম "কেন? বাঁধতে হবে কেন?"

"উপর থেকে যেন পড়ে না যাস।"

"পড়ে যাওয়ার কথা বলছিস কেন?"

"ফ্লাইং মেশিন উড়তে উড়তে যদি কাত হয়ে যায়? উল্টো হয়ে যায়?"

আমি শুকনো গলায় বললাম, "কাত হবে কেন? উল্টো হবে কেন?"

"ব্লাকহোলের বাচ্চা দিয়ে যে ইঞ্জিনটা বানিয়েছি সেটা যদি কন্ট্রোল না করা যায় তখন যা খুশি তা হতে পারে।"

"যা খুশি হবে মানে? কী হবে তুই জানিস না?"

"থিওরিটিক্যালী জানি। প্র্যাকটিক্যালী যা খুশী হতে পারে।"

আমি আমার সিট বেল্ট খুলতে খুলতে বললাম, " মিঠুন, তুই যা—আমি যাব না।"

কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে। মিঠুন সামনের প্যানেলে কী একটা সুইচ অন করে দিল—আর সাথে সাথে মিঠুনের ফ্লাইং মেশিনটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। মিঠুন অবাক হয়ে বলল, "আরে, কাঁপছে কেন?"

আমিও ভয় পেয়ে বললাম, "কী হয়েছে? কাঁপছে কেন?"

মিঠুন আমার কথায় উত্তর দিল না, প্যানেলের কী একটা হ্যান্ডেল ধরে টান দিল—তখন কাপুঁনীটা আরো বেড়ে গেল, আমি ভোঁতা একটা শব্দ শুনলাম আর নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ফ্লাইং মেশিনের নিচে দিয়ে আগুনের মত কী একটা বের হতে শুরু করেছে। আমি আমার পায়ে গরম বাতাসের একটা হলকা অনুভব করলাম। ভয় পেয়ে বললাম, "কী হয়েছে মিঠুন? কী হয়েছে?"

মিঠুন আমার কথার উত্তর দিল না, বিড়বিড় করে বলল, "ওয়েট ব্যালেন্স হয় নাই।"

আমি চিৎকার করে বললাম, "সেইটার মানে কী?

"টেক অফের সময় সমস্যা হতে পারে। শক্ত করে ধরে রাখিস?"

"কী শক্ত করে ধরে রাখব?"

মিঠুন হ্যান্ডেলটা আরো জোরে টেনে ধরল আর ঠিক তখন ফ্লাইং মেশিনটা পিছন দিকে কাৎ হয়ে গেল, আমি চিৎকার করে ভয়ে চোখ বন্ধ করে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ফ্লাইং মেশিনটা পিছন দিকে আরো কাত হয়ে আরো জোরে থর থর করে কাঁপছে–মনে হচ্ছে এক্ষুনি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ভয়ে আতংকে আমি চিৎকার করে বললাম, "নামব, আমি নামব। এইখানে থাকব না। তোর ফ্লাইং মেশিনের খেতা পুড়ি।"

আমি সিট বেল্ট খুলে নেমে যাচ্ছিলাম, মিঠুন তখন চিৎকার করে বলল, "খবরদার!" তারপর হাত দিয়ে আমাকে খপ করে ধরে ফেলল আর পুরো ফ্লাইং মেশিনটা তখন ডান দিকে কাত হয়ে গেল।

আমি চোখ খুলে তাকালাম আর হঠাৎ আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, ভয়ে আতংকে আমি জমে গেলাম। ফ্লাইং মেশিনটা আসলে ছাদের উপর নেই, কাঁপতে কাঁপতে সেটা উপরে উঠে যাচ্ছে, এর মাঝে আমরা কয়েকশ ফুট উপরে উঠে গেছি, নিচে স্কুল বিল্ডিংটাকে এখন একটা পোড়ো বাড়ীর মত মনে হচ্ছে।

মিঠুন বলল, "সীট বেল্ট বেঁধে ফেল।"

আমি ভাঙ্গা গলায় বললাম, "খোদার কসম লাগে। নিচে নামা।"

মিঠুন বলল, "সীট বেল্ট বাঁধ।"

আমি প্রায় কেঁদেই ফেললাম "নামা মিঠুন! তাড়াতাড়ি নামা।"

মিঠুন ধমক দিয়ে বলল, "সিট বেল্ট বাঁধ তা না হলে লাথি দিয়ে নিচে ফেলে দেব।"

মিঠুন সত্যি সত্যি লাথি দিয়ে ফেলে দেবে সেটা বিশ্বাসযোগ্য কোনো কথা না কিন্তু আমি তখন বাধ্য হয়ে কাঁপা হাতে সিট বেল্ট বাঁধলাম। মিঠুন হ্যান্ডেলটা নাড়াচাড়া করতে থাকে আর ফ্লাইং মেশিনটার কাপুনী কখনো বাড়তে থাকে কখনো কমতে থাকে। আমি ভয়ে নিচে তাকিয়ে দেখলাম, ফ্লাইং মেশিনের নিচে দিয়ে আগুনের শিখার মতো কিছু একটা বের হচ্ছে আর আমরা আস্তে আস্তে উপরে উঠছি। নিচে দোকানপাট, রাস্তা, গাড়ী, ট্রাক, টেম্পো সবকিছু ছোট হয়ে আসছে। আমার সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে আছে, প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি ফ্লাইং মেশিন নিয়ে আমরা হুড়মুড়

করে নিচে আছাড় খেয়ে পড়ে একেবারে ছাতু হয়ে যাব।

কিন্তু আমরা হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম না, আকাশে ঝুলে থাকলাম। আমি কাঁদো কাঁদো গলায় বললাম, "এই মিঠুন ! আর কতো উপরে যাবি? এখন থামা।"

"ঠিক আছে এখন উপরে উঠা বন্ধ করে দিই।"

"হ্যাঁ। শুধু বন্ধ করিস না, নিচে নেমে যা।"

মিঠুন বলল, "আগেই নিচে নামব কেন? সামনে পিছনে যাব না?"

"সামনে পিছে যাবি?"

"হ্যাঁ।" বলে মিঠুন আরেকটা হ্যান্ডেল ধরে টান দেয়। সাথে সাথে পুরো ফ্লাইং মেশিনটা একটা ঝাঁকুনী দিয়ে সামনে যেতে থাকে। আমি মুখে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা টের পেলাম, ভয়ে ভয়ে বললাম, "কতো জোরে যাচ্ছি?"

"ঘন্টায় ষাট সত্তুর কিলোমিটার হবে।"

"এতো জোরে যাওয়ার দরকার আছে?"

মিঠুন আমার কথার উত্তর না দিয়ে হ্যান্ডেলটা সামনে ঠেলে দিল, সাথে সাথে ফ্লাইং মেশিনটা ঝাঁকুনী দিয়ে কাত হয়ে যায়, আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। মিঠুন বলল, "ভয় পাস নে এখন এটাকে ঘোরাচ্ছি।"

"আর ঘুরাতে হবে না। এখন নিচে নামা।"

মিঠুন বলল, "নামাব। আগে ভালো করে টেস্ট করে নেই।"

"আকাশে ঝুলে থেকে টেস্ট করানোর দরকার আছে? নিচে নেমে টেস্ট করা যায় না?"

মিঠুন বলল, "আকাশে সামনে পিছে ডানে বায়ে উপরের নিচে সবদিকে ফাঁকা–নিচে এই রকম ফাঁকা জায়গা পাবি?"

আমি দুর্বলভাবে বললাম, "প্রথম দিনেই সব টেস্ট করে ফেলতে হবে? কাল পরশুর জন্যে কিছু রাখবি না?"

"কাল পরশুরটা কাল পরশু দেখা যাবে। আজকেরটা আজকে।" মিঠুন আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, চাঁদের আলোতে তার হাসিটা অবশ্যি খুব ভালো দেখা গেল না। মিঠুন এবারে তার ব্যাগটা খুলে ভিতর থেকে ফ্লাস্কটা বের করে বলল, "আয় চা খাই।"

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "চা? তুই এখন চা খাবি?"

"হ্যাঁ। উপরে একটু শীতশীত করছে। চা খেলে শরীর গরম হবে।

ফ্লাইং মেশিনটা পার্ক করে রেখেছি, এখন একজায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।"

আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না—যখন দেখলাম সত্যি সত্যি মিঠুন ফ্লাক্স থেকে একটা প্লাস্টিকের কাপে চা ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি কাঁপা হাতে কাপটা নিলাম মিঠুন তখন তার নিজের জন্যে এক কাপ ঢেলে নিয়ে খুব তৃপ্তি করে চায়ের কাপে চুমুক দিল। কেউ যদি একদিন আগেও আমাকে বলত যে পরের দিন আমি আকাশে ঝুলে থেকে চা খাব আমি কী সেটা বিশ্বাস করতাম?

চা খেতে খেতে মিঠুন বলল, "আমাদের এই ফ্লাইং মেশিনের সুবিধে কী জানিস?"

"কী সুবিধা?"

"এইখানে যে ফুয়েল আছে সেটা কোনোদিন শেষ হবে না"।

"শেষ হবে না?"

"না। এনার্জীটা খরচ হয় ই ইকুয়েলস টু এম সি স্কয়ার দিয়ে। তার মানে শক্তি প্রায় অফুরন্ত। তাছাড়া—"

"তাছাড়া কী?"

"যখন এনার্জী ব্যবহার করি না তখন আমার ধারণা ব্লাকহোলের বাচ্চা চারপাশের ভর শুষে বড় হতে থাকে। এটা যেহেতু অন্যরকম ভর তাই আমরা টের পাই না। তবে—"

"তবে কী?"

মিঠুন উত্তর না দিয়ে হঠাৎ করে মুখ সূঁচালো করে কিছু একটা ভাবতে লাগল। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা একটা অবাস্তব স্বপ্নের মত মনে হতে থাকে। গভীর রাতে আমি আর মিঠুন আকাশে ঝুলে ঝুলে চা খাচ্ছি। শুধু তাই না মিঠুন চা খেতে খেতে বৈজ্ঞানিক চিন্তার মাঝে ডুবে আছে। সত্যি কথা বলতে কী প্রথম প্রথম আমার যেরকম অসম্ভব ভয় লাগছিল, মনে হচ্ছিল এক্ষুণি বুঝি ধপাস করে আকাশ থেকে পড়ে যাব এখন আর সেরকম মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে আকাশে ঝুলে থাকা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার না।

আমি চা শেষ করে বললাম, "মিঠুন এখন নিচে চল।"

"হ্যাঁ" মিঠুন বলল, "একটু একটু ঠাণ্ডা লাগছে।"

মিঠুন তার কপালে লাগানো লাইটটা জ্বালিয়ে প্যানেলটা দেখে একটা সুইচ টিপে আরেকটা হ্যান্ডেল ধরে নিজের দিকে টেনে আনে। ফ্লাইং মেশিনটা একটা ঝাঁকুনী দিয়ে নিচে নামতে থাকে। আমি নিচের দিকে

তাকালাম, সেখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মিঠুনকে জিজ্ঞেস করলাম, "স্কুলটা কোন দিকে?"

"কী জানি?"

"কী জানি মানে?" আমি রেগে উঠে বললাম, "না জানলে যাবি কেমন করে?"

"সেটাই তো বুঝতে পারছি না!" মিঠুন বলল, "যখন সামনে পিছে ডানে বায়ে গেছি তখন অনেক দূরে সরে গেছি। তাছাড়া—"

"তাছাড়া কী?"

"বাতাসেও মনে হয় সরে এসেছি।"

"এখন?"

মিঠুন মাথা চুলকালো, "স্কুলটা খুঁজে বের করতে হবে।"

"কেমন করে খুঁজে বের করবি?"

মিঠুন মাথা নাড়ল, বলল, "জানি না আমি এর আগে কখনো আকাশে হারিয়ে যাইনি।"

সেটা সত্যি কথা। নিচে হারিয়ে গেলেও রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে কোথাও না কোথাও পৌঁছানো যায়। আকাশে কোনো রাস্তা নেই—আকাশে হারিয়ে গেলে কোনদিকে যেতে হবে বোঝার কোনো উপায় নেই।

অনেক কষ্ট করে যখন শেষ পর্যন্ত স্কুলটা খুঁজে পেলাম তখন ভোররাত হয়ে গেছে। ফ্লাইং মেশিনটা নিচে নামিয়ে মিঠুন বলল, "এতো রাতে বাসায় গিয়ে কী হবে? আর স্কুলে ঘুমিয়ে যাই।"

আমি বললাম, "তোর বাসায় চিন্তা করবে না?"

"নাহ!" মিঠুন বলল, বাসায় বলেছি আজ রাতে তোর বাসায় থেকে রাত জেগে সমাজ পাঠ পড়ব।"

"সমাজ পাঠ?"

"হ্যাঁ।" মিঠুন তার ফ্লাইং মেশিনের যন্ত্রপাতিগুলো টানাটানি করে কী যেন দেখল তারপর মুখ দিয়ে সন্তুষ্টির মত শব্দ করল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোর বাসায় চিন্তা করবে না?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "না। আমার বাসায় আব্বু ছাড়া আর কেউ নাই। আব্বু আমাকে নিয়ে কখনো মাথা ঘামায় না। কয়েক রাত বাসাতে না গেলেও আব্বু বুঝতেই পারবে না।"

মিঠুন বলল, "তোর কী মজা !"

আমি ছোট একটা নিশ্বাস ফেললাম। সত্যিই কী আমার অনেক মজা।

মিঠুন ল্যাবরেটরি ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলে উঠে বলল, "উড়তে পারলাম কী না?"

"পেরেছিস। তুই একটা জিনিয়াস।"

"সত্যি? তোর তাই মনে হয়?"

"হ্যাঁ। সুপার জিনিয়াস।"

মিঠুন বাচ্চা ছেলের মত খুশী হয়ে উঠল, "শুধু তুই ভালো ভাবে দেখেছিস। সবাই শুধু বকাবকি করে।"

"এই ফ্লাইং মেশিন দেখলে বকাবকি করবে না। যেই দেখবে সেই ট্যারা হয়ে যাবে কেনো সন্দেহ নাই।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। প্রথমবার উঠার সময় একটু ভয় পেতে পারে— কিন্তু একটু অভ্যাস হয়ে গেলে ট্যারা হয়ে যাবে। কোনো সন্দেহ নাই।"

মিঠুন টেবিলটাতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি আরেকটা টেবিলে শুয়ে পড়লাম। সারারাত ঘটনাগুলো মাথার মাঝে খেলা করছিল। মনে হচ্ছিল বুঝি ঘুমই আসবে না, কিন্তু এক সময় সত্যিই ঘুমিয়ে গেলাম।

পরের দিন খুব উত্তেজনার মাঝে গেল। আমি যখন ঝুম্পা ফারা আর বগাকে ফ্লাইং মেশিনের কথা বললাম, তারা প্রথমে আমার কথা বিশ্বাসই করতে চাইল না। তাদের ল্যাবরেটরি ঘরে ফ্লাইং মেশিনটা দেখানো হল তারপরও তারা বিশ্বাস করতে চাইল না। অনেক রকম কীরা কসম কাটার পর শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করল, তখন সবাই এক সাথে ফ্লাইং মেশিনে উঠতে চাইল।

মিঠুন, বলল "একসাথে তো সবাই উঠতে পারবে না। একজন একজন করে উঠতে হবে।"

ঝুম্পা বলল, "ঠিক আছে, একজন একজন করেই উঠি। আগে আমাকে ওঠা।"

মিঠুন মাথা চুলকে বলল, "দিনের বেলা ওঠা তো ঠিক হবে না। সবাই দেখে ফেলবে।"

ঝুম্পা বলল, "দেখে ফেললে সমস্যা কী?"

মিঠুন বলল, "এখনই জানাজানি হলে সমস্যা আছে। প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে মারা যাব।"

ঝুম্পা বলল, "ঠিক আছে তাহলে রাত্রি বেলাই চলে আসব।"

মিঠুন বলল, "তুই আসবি ঠিক আছে কিন্তু আমাকে বাসা থেকে রাত্রি বেলা বের হতে দিচ্ছে না।"

"কেন?"

"সেদিন যে ইবুর সাথে রাতে গেলাম তখন আম্মু সন্দেহ করেছে। এখন কয়দিন বাসা থেকে বের হতে দিচ্ছে না।"

আমি বললাম, "রাত্রি বেলা চোরের মত ফ্লাইং মেশিনে উড়ে কোনো মজা নাই। দিনের বেলা উড়তে হবে।"

মিঠুন খানিকক্ষণ চিন্তা করল তারপর মাথা নেড়ে বলল, "ঠিকই বলেছিস। আমারা কী চুরি করেছি নাকি যে চোরের মত থাকতে হবে?"

ঝুম্পা হাতে কিল দিয়ে বলল, "চল তাহলে এখনই উড়ি।"

বগা বলল, "আমিও উড়ব।"

ফারাহ বলল, "আমি কী দোষ করলাম?"

"একসাথে তো সবাইকে নেয়া যাবে না। এখন একসাথে মাত্র দুইজন উঠতে পারবে।"

আমি বললাম, "এটাকে আরো একটু বড় করে ফেল, সবাই যেন একসাথে উঠতে পারে।"

ঝুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ, সবাই একসাথে উঠতে পারলে বেশি মজা হবে।"

মিঠুন বলল, "আমি একটু সময় পেলে আরেকটু বড় করতে পারি। সবার বসার জন্যে চেয়ার লাগিয়ে দিলেই হয়। ইঞ্জিনটা আরেকটু পাওয়ার ফুল করতে হবে, ভোল্টেজ কন্ট্রোলটার সার্কিটটা একটু বদলে দিতে হবে। আর ওয়েট ব্যালেন্সটা দেখতে হবে। স্ট্যাবিলিটির জন্যে একটা ফিন দেয়া যেতে পারে—" মিঠুন বিড় বিড় করে অনেকটা নিজের সাথে কথা বলতে থাকে— তার কিছুই আমরা বুঝতে পারলাম না।

যাই হোক মিঠুন তখন তখনই তার ফ্লাইং মেশিনে আরো তিন চারজন বসার মতো জায়গা করার কাজে লেগে গেল।

আমাদের মহাব্বতজান স্কুলে কে ক্লাশে আছে কে নেই সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ক্লাশে এলেও আমরা কিছু শিখি না, না এলেও আমাদের কোনো ক্ষতি হয় না। তাই যখন ক্লাশ হচ্ছে তখন মিঠুন ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে লাগল, তার সাথে আমরা দুই একজন থাকতে লাগলাম তাকে সাহায্য করার জন্য।

বিকেল বেলা স্কুল ছুটির পর আমরা বাসায় যাচ্ছি তখন হঠাৎ একটা গাড়ী আমাদের পাশে থেমে গেল, গাড়ীর জানালা দিয়ে মাথা বের করে একজন মানুষ একটা দামী ক্যামেরা দিয়ে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে কয়েকটা ছবি তুলে নিয়ে আবার গাড়ী চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি অবাক হয়ে মিঠুনের দিতে তাকিয়ে বললাম, "কী হল? আমাদের ছবি তুলল কেন?"

মিঠুন মাথা চুলকে বলল, "বুঝতে পারছি না। মনে হয় ব্ল্যাকহোলের বাচ্চার কথা জানাজানি হয়ে গেছে।"

আমি বললাম, "জানাজানি হলে ক্ষতি কী? এখন সবাইকে বলে দিলেই হয়।"

মিঠুন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "বলে দিব?"

"দিবি না কেন?"

"কিন্তু কী বলব? নিজেই তো জানি না জিনিষটা কী। এটাকে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা বলছি কিন্তু এটা কী বৈজ্ঞানিক নাম হতে পারে? বৈজ্ঞানিক নাম হতে হলে এটাকে বলা দরকার ব্ল্যাকিওন না হলে সুপার মাসিভ বোজন না হলে এনার্জী রিলিজিং পার্টিকেল— সংক্ষেপে ইআরপি—"

প্রত্যেকটা নামই আমার পছন্দ হল। আমি বললাম, "তুই ইচ্ছা করলে এর যে কোনো একটা নাম দিতে পারিস কিংবা তিনটা মিলিয়েই একটা নাম তৈরী করে ফেল।"

"তিনটা মিলিয়ে? ই আরপি সুপার মাসিভ বোজনিক ব্ল্যাকিওন?"

"হ্যাঁ, ফাটাফাটি শোনাচ্ছে নামটা।"

মিঠুনকে কেমন যেন চিন্তিত মনে হল। দুইজনে কথা বলতে বলতে যাচ্ছি হঠাৎ করে বড় বড় সাইজের দুজন মানুষ আমাদের থামাল। সুন্দর চেহারা কিন্তু চুলগুলো ছোট করে ছাটা সে জন্যে কেমন জানি হাবা হাবা দেখতে। হাবা হাবা চেহারার একজন বলল, "এই ছেলে দাঁড়াও।"

আমাকে বলেছে না মিঠুনকে বলেছে বুঝতে পারলাম না তাই দুজনেই দাঁড়ালাম। হাবা চেহারার একজন মিঠুনকে ধরে ফেলে তার সার্ট প্যান্টে হাত বুলাতে লাগল। মিঠুন অবাক হয়ে বলল, "কী করছেন?"

"সার্চ করছি।"

"কেন সার্চ করছেন?"

"দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য আমরা যে কোনো মানুষকে সার্চ করতে পারি।"

"আমি কী আইন শৃঙ্খলা নষ্ট করেছি?"

"করতেও তো পার।"

মিঠুন বলল, "আপনি এটা করতে পারেন না– আমাকে যেতে দিন।"

"বেশী কথা বলবে না। তাহলে এক কিল দিয়ে তোমার মাথাটা শরীরের ভিতর ঢুকিয়ে দিব।"

মানুষটার যা সাইজ আসলেই এক কিল দিয়ে মাথাটা শরীরের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে পারে। তাই মিঠুন আর কথা বলল না। মানুষটা মিঠুনের জামা

কাপড় পরীক্ষা করল, তার ব্যাগ খুলে ভিতরে দেখল, হাত ঢুকিয়ে নাড়া চাড়া করল। মিঠুনের ব্যাগে অনেক রকম ছোট বড় শিশি বোতল কৌটা থাকে সেগুলি খুলে খুলে দেখতে লাগল।

মিঠুন বলল, "এগুলি খুলবেন না।"

"কেন খুলব না?"

"ভিতরে আমার দরকারী জিনিষ আছে।"

"কী তোমার দরকারী জিনিষ?" বলে হাবা চেহারার মানুষটা ছোট একটা কৌটা খুলতেই ভেতর থেকে ক্রুদ্ধ শব্দ করে কিছু বোলতা বের হয়ে মানুষটাকে আক্রমণ করল। মানুষটা চিৎকার করে ঝাড়া দিয়ে হাতে এবং ঘাড়ের দুইটা বোলতা সরাতে পারলেও নাকেরটা ঝাড়তে পারল না, সেটা একটা কামড় দিয়ে দিল। হাবা চেহারার মানুষটা গগন বিদারী চিৎকার দিয়ে লাফাতে থাকে এবং দেখতে দেখতে তার নাকটা টমেটোর মতো ফুলে উঠে। একটু আগে তাকে হাবার মত লাগছিল এখন কেমন জানি কার্টুনের মত দেখাতে থাকে।

মানুষটা নাক চেপে ধরে চিৎকার করে বলল, "কীঁ রেঁখেছ বঁ্যাগের ভিঁতর? মাঁথা খাঁরাপ নাঁকী?"

মিঠুন বলল, "আমি আগেই না করেছি। আমার কথা শুনেন নাই।"

অন্য মানুষটা তখন মিঠুনের ব্যাগ ছেড়ে দিয়ে আমার ব্যাগটা সার্চ করতে থাকে। ব্যাগে কী খুঁজল কে বলতে পারে— এর ভিতরে কী আছে কে জানে, আমি নিজেও জানি না! ব্যাগ দেখা শেষ করে আমার জামা কাপড় দেখতে থাকে। শহরের রাস্তায় প্রকাশ্য দিনের বেলায় পাহাড়ের মতন দুইজন মানুষ আমাদের মত দুইটি বাচ্চাকে এভাবে সার্চ করছে দেখে এতোক্ষণে আশেপাশে ভীড় জমে গেছে। কলেজ ইউনির্ভার্সিটি ছাত্রের মত দেখতে একজন আমাদের জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

আমি বললাম, "বুঝতে পারছি না। মনে হয় ছেলে ধরা।"

আর যায় কোথায়। সাথে সাথে আমাদের ঘিরে থাকা মানুষগুলো হই হই করে উঠল, শুনতে পেলাম, কয়েকজন চিৎকার করে বলল, "ধর শালাদের।"

বিশাল একটা হুটোপুটি লেগে যায়। মানুষগুলো চিৎকার করে বলল, "আমরা ছেলেধরা না— আমরা ইন্টেলিজেন্স এর লোক।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা– আমরা হুটোপুটির মাঝে বের হয়ে দে দৌড়।

এর পরের কয়েকদিন আমরা টের পেলাম আমাদের নিয়ে–বিশেষ করে মিঠুনকে নিয়ে কিছু একটা ঘটছে। যখনই আমরা বের হই তখনই মনে হয় আমাদের পিছু পিছু কেউ হাঁটছে। হঠাৎ করে গাড়ি পাশে দাঁড়িয়ে যায়– আমরা তখন ছুটে পালাই, গাড়ীর ভেতর থেকে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে ছবি তুলে নেয়। ব্ল্যাকহোলের বাচ্চার জন্যেই এসব ঘটছে, কাজেই আমাদের প্রথম কাজ হল সেটাকে ভালো করে লুকিয়ে রাখা। ফ্লাইং মেশিনের ভেতর থেকে আসল ব্ল্যাকহোলের বাচ্চাটা সরিয়ে আমরা সেখানে ফাঁকা একটা শিশি রেখে দিলাম। আসলটা লুকিয়ে রাখলাম ল্যাবরেটরির কংকালটার খুলির ভিতরে।

মিঠুন খুব খাটাখাটুনি করে শেষ পর্যন্ত ফ্লাইং মেশিনটাকে দাড়া করাল। দুজনের জায়গায় এখন ছয়জন যেতে পারবে। সেজন্যে ইঞ্জিনটার পরিবর্তন করল, পাখাগুলো পরিবর্তন করল, পিছনে প্লেনের লেজের মত একটা লেজ লাগালো। তারপর একদিন আমাদের বলল, "আমি রেডি। আমরা এখন ছয়জন যেতে পারব।"

স্কুল ছুটির পর আমরা রয়ে গেলাম। স্কুলের স্যার, ম্যাডামরা ছুটির আগেই চলে যায়, ছাত্র-ছাত্রীরা যায় একটু পরে। তারা চলে যাবার পর পুরো স্কুল ফাঁকা হয়ে গেল। তখন আমি, মিঠুন, ঝুম্পা বগা আর ফারা দোতালায় উঠে গেলাম। মিঠুনের ফ্লাইং মেশিনটা ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এলাম, মিঠুন পুরোটা ভাল করে দেখল, এখানে সেখানে ধাক্কা দিল, টানাটানি করল, ঝাঁকুনি দিল, টেপাটেপি করল। তারপর কংকালের করোটির ভেতর থেকে ব্লাকহোলের বাচ্চা ভরা শিশিটা নিয়ে ফ্লাইং মেশিনে লাগিয়ে দিল।

তারপর আমরা ফ্লাইং মেশিনে উঠলাম, দুইটি করে সিট, প্রথমে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে মিঠুনের পাশে আমি বসতে চেয়েছিলাম কিন্তু ঝুম্পা জোর করে আমার জায়গায় বসে গেল। মাঝখানে বসল বগা আর ফারা। পিছনে আমি একা।

মিঠুন বলল, "সবাই সিট বেল্ট বেঁধে নে।"

আমার সিট বেল্ট বেঁধে নিলাম।

"তোরা কেউ ভয় পাবি না— এটা কাঁপতে পারে, দুলতে পারে উপর নিচ করতে পারে কিন্তু কখনোই নিচে পড়ে যাবে না।"

আমরা মাথা নাড়লাম, বললাম "ঠিক আছে।"

"সিট থেকে বেশি নাড়াচাড়া করবি না— সেন্টার অফ গ্রাভিটি অনেক গবেষণা করে ঠিক জায়গায় রাখা হয়েছে— নাড়াচাড়া করলে সেন্টার উনিশ

বিশ হতে পারে— তখন ফ্লাইটেরও উনিশ বিশ হতে পারে।"

মিঠুনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বুঝতে পারলাম না— সিটে বেশি নাড়াচাড়া না করার বিষয়টা খালি বুঝতে পারলাম। সেটার জন্যই জোরে জোরে মাথা নাড়লাম।

"তাহলে শুরু করছি—" বলে মিঠুন কন্ট্রোল প্যানেলের একটা সুইচ টিপে ধরল, সাথে সাথে ফ্লাইং মেশিন থরথর করে কাঁপতে থাকে। ফারা ভয় পেয়ে বলল, "কী হচ্ছে? কী হচ্ছে এখানে?"

মিঠুন বলল, "ভয়ের কিছু নাই। চুপ করে বসে থাক।"

"ভেঙ্গে পড়ে যাবে না তো?"

"না ভাঙবে না। সবাই শক্ত হয়ে বসে থাক আমরা টেক অফ করছি।"

মিঠুন একটা হ্যান্ডেল নিজের দিকে টেনে নিল। সাথে সাথে ফ্লাইং মেশিনের নিচ দিয়ে আগুনের একটা হলকা বের হতে থাকে আর ফ্লাইং মেশিনটা পিছনের দিকে কাত হয়ে উপরে উঠতে শুরু করল। আমরা সবাই একই সাথে ভয় আর আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। দেখতে দেখতে ফ্লাইং মেশিনটা স্কুলের ছাদ পার হয়ে গাছগুলো পার হয়ে উপরে উঠে যায়।

আমরা সবাই আবার ভয় আর আনন্দের শব্দ করে উঠলাম। মিঠুন আরেকটা হ্যান্ডেল টেনে ধরতেই ফ্লাইং মেশিনটা কাত হয়ে ঘুরে যেতে শুরু করে, আমাদের মুখে বাতাসের ঝাপটা লাগতে থাকে আর ফ্লাইং মেশিনটা ঘুরে যেতে শুরু করে। আমরা নিচের দিকে তাকালাম, স্কুলটাকে ঠিক চেনা যায় না- দোকান পাট, রাস্তা, রাস্তায় গাড়ী ট্রাক টেম্পো সবকিছুকে কেমন যেন খেলনার মত মনে হতে থাকে।

মিঠুন চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, "কেমন লাগছে?"

ঝুম্পা বলল, "ফাটাফাটি।"

ফারা জিজ্ঞেস করল, "পড়ে যাব না তো?"

"না, পড়বি না।"

ঝুম্পা বলল, "আরো উপরে নিয়ে যা— অনেক উপরে।"

বগা ভয়ে ভয়ে বলল, "কোনো সমস্যা হবে না তো?"

ঝুম্পা বলল, "হলে হবে। নিয়ে যা উপরে।"

মিঠুন তখন ফ্লাইং মেশিনটাকে আরো উপরে নিয়ে যায় সেখান থেকে নিচের পৃথিবীটাকে কেমন যেন অবাস্তব মনে হতে থাকে।

মিঠুন ফ্লাইং মেশিনটাকে ওপরে এক জায়গায় থামিয়ে দিয়ে বলল,

"এখানে পার্ক করলাম।"

বগা বলল, "পার্ক করলি?"

"হ্যাঁ। এখানে চুপচাপ ভেসে থাকব।"

আমি বললাম, "মোটেও চুপচাপ ভেসে নাই। তোর ইঞ্জিনটা শোঁ শোঁ করে শব্দ করছে।"

মিঠুন বলল, "আমি ইচ্ছে করলে ইঞ্জিনটা বন্ধ করে শব্দও বন্ধ করে দিতে পারি। তবে—"

"তবে কী"?

"তাহলে এই ফ্লাইং মেশিন মারবেলের মতন টুপ করে নিচে পড়ে যাবে।"

ঝুম্পা হি হি করে হাসল বলল, "থাক বাবা তোর ইঞ্জিন বন্ধ করার কোনো দরকার নাই। আমি এর মাঝে বসে বসেই প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পারব।"

আমরা সবাই তখন চারিদিকে তাকালাম, বাতাসে ভাসতে ভাসতে আমরা অনেকদূর সরে এসেছি। নিচে একটা সরু নদী দেখা যাচ্ছে, রোদ পড়ে সেটা চিক চিক করছে। নদীটার ওপার একটা নৌকা— কী আশ্চর্য সেই দৃশ্য। নদীর দুই তীরে সবুজ ধানক্ষেত, ধানক্ষেত যে এতো সবুজ হতে পারে আমি আগে কখনো দেখিনি।

মিঠুন বলল, "আমার মনে হয় এখন আমরা ব্ল্যাকহোলের বাচ্চার কথা সবাইকে বলে দিই।"

ঝুম্পা থাবা দিয়ে বলল, "অবশ্যই বলে দিব।"

বগা বলল, "একটা সাংবাদিক সম্মেলন করতে হবে। সেখানে মিঠুন একটা লিখিত বক্তব্য দেবে। তারপর প্রশ্ন এবং উত্তর।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সাংবাদিকেরা যদি না আসে?"

ঝুম্পা আরেকবার ফ্লাইং মেশিনের গায়ে থাবা দিয়ে বলল, "আসবে না মানে? একশবার আসবে। সাংবাদিকদের বাবারা আসবে। এই রকম ফ্লাইং মেশিন তারা বাপের জন্মে দেখেছে?"

আমি বললাম, "ইন্টেলিজেন্সের লোকজন আমাদের পিছনে লেগে গেছে, সাংবাদিকদের বলে সবাইকে জানিয়ে দিলে ওরা আর কিছু করতে পারবে না।"

মিঠুন মাথা চুলকে বলল, "কিন্তু সাংবাদিকদের কী বলব?"

বগা বলল, "কিছু বলতে হবে না, ফ্লাইং মেশিনটা চালিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে আসবি। সব সাংবাদিকেরা অধৈর্য্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর আমরা আকাশ থেকে নেমে আসলাম। চিন্তা করতে পারিস কী মজা হবে?"

ফারা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমরা? আমরা সবাই?"

মিঠুন বলল, "হ্যাঁ। আমি একা একা যাব নাকি? আমার কী মাথা খারাপ হয়েছে?"

ফারা জিজ্ঞেস করল, "আমরা গেলে আমাদেরকেও কী প্রশ্ন করবে?"

আমি বললাম, "করতেও পারে।"

ফারা বলল, "সর্বনাশ! আমি যে কিছুই জানি না।"

"না জানার কী আছে?" আমি বললাম, "বলবি পৃথিবীর মানুষ মাত্র শতকরা চার ভাগ পদার্থের কথা জানে। যে ছিয়ানব্বই ভাগের কথা জানে না– এটা হচ্ছে সেই ছিয়ানব্বই ভাগের ব্ল্যাকহোল।" আমি মিঠুনের দিকে তাকিয়ে বললাম, "ঠিক বলেছি না রে মিঠুন?"

মিঠুন বলল, "ঠিক বলেছিস।"

ফারা বলল, "এইটুকু বললেই হবে?"

মিঠুন বলল, "আরেকটু বলতে পারিস। বলবি এই ব্ল্যাকহোলের বাচ্চাকে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মাঝে রাখলে তার ভরটা শক্তিতে পাল্টে যায়।"

আমি বললাম, "আইনস্টাইনের ই ইকুয়েলস টু এম সি স্কয়ার হিসাবে, তাই না মিঠুন?"

মিঠুন বলল, "ঠিক বলেছিস। এটাই হচ্ছে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চার আসল গুরুত্ব। পৃথিবীর এনার্জি ক্রাইসিস মিটিয়ে দিতে পারবে।"

আমি বললাম, "এই তো হয়ে গেল। সাংবাদিক সম্মেলনে আর কিছু বলার দরকার নাই। তখন তাদেরকে খালি ফ্লাইং মেশিনটা দেখাতে হবে– দেখলেই সবাই ট্যারা হয়ে যাবে।"

ঝুম্পা বলল, "ইবুর কথা ঠিক। সবাই ট্যারা হয়ে যাবে। ভুবন ট্যারা।"

মিঠুন বলল, "খালি একটা সমস্যা।"

বগা জিজ্ঞেস করল, "কী সমস্যা?"

"আমরা তো এইটাকে বলছি ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা। সেইটাতো বৈজ্ঞানিক নাম হল না। একটা বৈজ্ঞানিক নাম দিতে হবে। সেইটা কী হতে পারে?"

আমি নামটা বলার চেষ্টা করার আগেই ঝুম্পা বলল, "কেন? এইটার নাম হবে মিঠুনিয়াম।"

মিঠুন চমকে উঠে বলল, "মিঠুনিয়াম?"

"হ্যাঁ। এটা তুই আবিষ্কার করেছিস তাই এটা হতে হবে তোর নামে—মিঠুনিয়াম।"

আমরা মাথা নাড়লাম, বললাম, "হ্যাঁ ঠিকই বলেছে। এটার নাম হবে মিঠুনিয়াম।"

মিঠুন দুলে দুলে হাসল, বলল, "তোদের কারো মাথার ঠিক নাই।"

"কেন?"

"নিজের নাম ব্যবহার করে আবার নাম দেয়া যায় নাকী?"

বগা হাতে কিল দিয়ে বলল, "একশবার দেয়া যায়। আমাদের স্কুলের নাম কী মহব্বত জানের নামে হয় নাই?"

আমরা বললাম, "হয়েছে হয়েছে।'

মিঠুন শুনতেই রাজী হল না, বলল, "হলে হয়েছে, আমার বেলা হবে না। আমি কিছুতেই এটার নাম মিঠুনিয়াম দিব না।"

ফারা বলল, "তোরা শুধু শুধু তর্ক করছিস। আমার কী মনে হয় জানিস?"

"কী?"

"ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা খুব সুন্দর একটা নাম। এটার নাম থাকুক ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা।"

মিঠুন প্রতিবাদ করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ করে সে থেমে গিয়ে বলল, "সর্বনাশ!"

"কী হয়েছে?"

"ঐ দেখ।"

মিঠুন হাত দিয়ে দূরে দেখাল, আমরা সবাই দেখলাম, অনেক দূরে একটা হেলিকপ্টার, সেটা আমাদের দিকে আসছে।

বগা বলল, "আমাদের ধরতে আসছে।"

ফারা জিজ্ঞেস করল, "আমাদেরকে কেন ধরতে আসবে? আমরা কী করেছি?"

আমি বললাম, "আমাদেরকে ধরতে আসছে না, এটা আসছে আমদের ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা কেড়ে নিতে।"

ফারা বলল, "সর্বনাশ!"

বগা বলল, "এখন কী করব?"

আমি বললাম, "পালা।"

মিঠুন জিজ্ঞেস করল, "কোথায় পালাব?"

ঝুম্পা এদিক সেদিক তাকাল তারপর দূরে সাদা মেঘের দিকে তাকিয়ে বলল, "চল ঐ মেঘের ভিতরে লুকিয়ে যাই।"

"মেঘের ভিতরে?"

"হ্যাঁ।"

মিঠুনের মনে হল আইডিয়াটা পছন্দ হল। সে একটা হ্যান্ডেল টেনে ধরতেই ফ্লাইং মেশিন থরথর করে কেঁপে উঠে তারপর কাত হয়ে ঘুরে সেটা মেঘের দিকে ছুটে যেতে থাকে। আমরা পিছন ফিরে দেখলাম হেলিকপ্টারটা খুব জোরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে আমরা এখন হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেতে শুরু করেছি। মনে হচ্ছে এটা সোজাসুজি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

মিঠুন ফ্লাইং মেশিনটার বেগ বাড়াতে থাকে, আমাদের মুখে বাতাসের তীব্র ঝাপটা এসে লাগল, আমরা প্রচণ্ড বেগে মেঘের দিকে ছুটে যেতে লাগলাম। কিন্তু হেলিকপ্টারটা আমাদেরকে প্রায় ধরে ফেলছে। আমরা হেলিকপ্টারের পাইলট, তার পাশে বসে থাকা একজন মিলিটারী ধরণের মানুষকে দেখতে পেলাম। পেছনে আরো কিছু মানুষ আছে, সবাই অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

মিঠুন হ্যান্ডেলটা টেনে রাখল আর হেলিকপ্টারটা যখন আমাদের খুব কাছে চলে এল তখন আমরা মেঘের ভেতর ঢুকে গেলাম। মেঘটা কী রকম হয় সেটা নিয়ে সব সময় আমার একটা কৌতূহল ছিল, মেঘের ভিতর ঢুকে পড়ার পর বুঝতে পারলাম এটা আসলে খুব ঘন কুয়াশার মত। আমরা ঘন কুয়াশার মত মেঘের ভিতরে সত্যি সত্যি লুকিয়ে যেতে পারলাম আর হেলিকপ্টারটা তখন থেমে গেল। এটা মেঘের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল উপরে উঠল নিচে নামল আমাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করল কিন্তু আমাদের খুঁজে পেল না, আমরা ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রইলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পর হেলিকপ্টারটা চলে গেল তখন আমরা খুব সাবধানে মেঘ থেকে বের হয়ে এলাম। এদিক সেদিক তাকিয়ে আমরা তখন আমাদের স্কুলে ফিরে যেতে থাকি।

প্রথম দিন আমি আর মিঠুন যেভাবে হারিয়ে গিয়েছিলাম আজকেও আমাদের সেই একই অবস্থা হল, আমরা আবার হারিয়ে গেলাম। তবে আজকে আমাদের অবস্থা প্রথম দিনের মত তত খারাপ হল না। প্রথমত আজকে এখনো দিনের আলো আছে, নিচে দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত আজকে ছয়জন মানুষ থাকায় কোনদিকে যেতে হবে সেটা সবাই মিলে বের করে ফেলা যাচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত যখন স্কুলটা পাওয়া গেল তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। পরের দিন সাংবাদিক সম্মেলন করে সাংবাদিকদের ফ্লাইং মেশিনটা দেখাব ঠিক করে আমরা স্কুলের ছাদে নেমে এলাম।

ঠিক যখন ফ্লাইং মেশিনটা ছাদে নেমেছে, মিঠুন সুইচ অফ করে ইঞ্জিনটা বন্ধ করেছে তখন হঠাৎ চারপাশ থেকে কালো পোষাক পরা ডজন খানেক মানুষ হাতে ভয়ংকর ভয়ংকর অস্ত্র নিয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা আমাদের মুখ চেপে ধরে রাখল যেন আমরা চিৎকার করতে না পারি। আমাদেরকে টেনে হেঁচড়ে তারা নিচে নিয়ে বড় একটা গাড়িতে ঢুকিয়ে দেয়। কিছু বোঝার আগে ভিতরের মানুষগুলো আমাদের হাত পা বেঁধে মুখে টেপ লাগিয়ে দেয়।

আমরা হুটোপুটি করে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করলাম, খুব একটা লাভ হল না। অবাক হয়ে দেখলাম ডজন খানেক মানুষ আমাদের ফ্লাইং মেশিনটা ধরাধরি করে নামাচ্ছে। আমাদের গাড়ির পিছনে আরেকটা মিলিটারী ট্রাক, ফ্লাইং মেশিনটাকে সেখানে তুলে ফেলা হল। তারপর আমাদের গাড়িটি আর পিছু পিছু ট্রাকটা চলতে শুরু করে, আমাদের কোথায় নিচ্ছে আমরা সেটা বোঝার চেষ্টা করলাম কিন্তু খুব একটা লাভ হল না কারণ গাড়ি চলতে শুরু করতেই তারা আমাদের চোখ কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল।

আমি বুঝতে পারলাম আমরা ভয়ংকর একটা বিপদের মাঝে পড়েছি।

আমদেরকে যেখানে আটকে রেখেছে সেটা মনে হয় বড় একটা বাসার উপরের তালার একটা রুম। রুমটায় ঢুকিয়ে মানুষগুলো আমাদের হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিয়েছে— তখন আমরা নিজেরাই চোখের বাঁধন খুলেছি, মুখের উপর লাগানো টেপটা খুলেছি। আমরা এখন একজন আরেকজনকে দেখতে পাচ্ছি, একজনের সাথে আরেকজন কথা বলতে পারছি। প্রথম কথা বলল ঝুম্পা, "আমি যদি এই হারামজাদাদের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে না দেই তাহলে আমার নাম ঝুম্পা না।"

ফারা একটু অবাক হয়ে বলল, "তুই কেমন করে ভুঁড়ি ফাঁসাবি?"

ঝুম্পা বলল, "জানি না।"

আমি বললাম, "এরা অনেক ক্ষমতাবান। আমাদের কীভাবে ধরে এনেছে দেখেছিস?"

বগা জানতে চাইল, "কেন ধরে এনেছে?"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "সেটা এখনো বুঝতে পারছিস না গাধা কোথাকার? ওরা ধরে এনেছে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চার জন্য।"

"কী করবে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা দিয়ে?"

"কী করবে মানে? তুই দেখছিস না ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা দিয়ে কী করা যায়? আমরা আকাশ থেকে উড়ে এসেছি ছোট বিন্দি একটা ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা দিয়ে আর তুই জিজ্ঞেস করছিস কী করা যায়?"

মিঠুন কোনো কথা না বলে ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখল। একটা টেবিল একটা চেয়ার একপাশে একটা খাট, খাটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানা। সাথে একটা ছোট হাইফাই বাথরুম। একটা জানালা বাসার ভেতরের দিকে আরেকটা জানালা বাইরের দিকে। সেদিকে তাকালে দেখা যায় দূরে উঁচু একটা বাউন্ডারী ওয়াল। বাউন্ডারী ওয়ালের অন্যপাশে কী আছে আমরা জানি না।

মিঠুনকে কেমন জানি মনমরা দেখাল, এদিক সেদিক দেখে বলল, "শুধু শুধু আমার জন্যে তোদের কতো রকম যন্ত্রণা। আমি মানুষটাই অপয়া। যেখানে হাত দেই সেখানেই সর্বনাশ হয়ে যায়।"

ফারা বলল, "তুই অপয়া হবি কেন? তোর কী দোষ? তুই হচ্ছিস আমাদের সায়েন্টিস্ট।"

মিঠুন একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "এখন আমাদের কী করবে কে জানে! যদি মেরে ফেলে?"

ঝুম্পা বলল, মেরে ফেলবে? ফাজলেমী নাকী?"

মিঠুন, "আমাদের ব্ল্যাকহোলের বাচ্চাটা আসলে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অনেক বেশী।"

মন খারাপ মনে হয় ছোঁয়াচে, মিঠুন মন খারাপ করে কথা বলা মাত্র আমার সবারই কম বেশী মন খারাপ হয়ে গেল। ঝুম্পা বলল, "আমাদের মেরে ফেলুক আর না ফেলুক আমার জীবন শেষ।"

ফারা জিজ্ঞেস করল, "কেন তোর জীবন শেষ কেন?"

"কতো রাত হয়েছে এখনো বাসায় যাই নাই, মামা মামী কী আমাকে বাসায় ঢুকতে দিবে? দিবে না। বাসা থেকে বের করে দিবে।"

আমি বললাম, "সেইটা নিয়ে পরে চিন্তা করা যাবে, আগে দেখ এখন কী হয়।"

বগা বলল, "খিদে লেগেছে।"

আমরা সবাই অবাক হয়ে বগার দিকে তাকালাম, আমি গরম হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "এরকম সময় তোর খিদে পেয়ে গেল?"

"খিদে পেলে আমি কি করব?"

"চুপ করে বসে থাকবি।"

ফারা বলল, "ব্যাস অনেক হয়েছে, এখন আর নিজেদের মাঝে ঝগড়া করিস না।"

আমরা তখন দেওয়ালে হেলান দিয়ে মেঝেতে বসে রইলাম। কী হয় দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। এর চাইতে কষ্টের কিছু আছে কী না কে জানে।

ঘণ্টা খানেক পরে বাইরে পায়ের শব্দ পেলাম, দরজায় একটা শব্দ হল তারপর খুট করে দরজা খুলে গেল। দরজার বাইরে কালো পোষাক পরা

একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটার উচুঁ চোয়াল সরু ঠোঁট। নাকের নিচে নবাব সিরাজদৌল্লার মত চিকন গোঁফ।

মানুষটা দরজাটা বন্ধ করে আমাদের দিকে তাকাল। চোখের দৃষ্টির মাঝে কিছু একটা আছে যেটা দেখে কেমন যেন অস্বস্তি হয়, ভয় করে।

মানুষটা ঘরের ভেতর হাঁটল, জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল তারপর আবার হেঁটে টেবিলটার কাছে এসে চেয়ারে পা রেখে টেবিলটাতে বসল। তারপর মিঠুনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "তুমি নিশ্চয়ই মিঠুন।"

মিঠুন কোনো কথা বলল না।

মানুষটা মুখের মাঝে হাসি হাসি ভাব এনে বলল, "যার নামে বিখ্যাত মিঠুনিয়াম তৈরী হবে?"

আমরা চমকে উঠলাম, ব্ল্যাকহোলের বাচ্চাকে মিঠুনিয়াম নাম দেওয়ার কথাটা বলেছিল ঝুম্পা, আমরা তখন ছিলাম আকাশে। এই মানুষ সেই কথা কেমন করে জানল? মানুষটা বলল, "আমার কিন্তু ব্লাকহোলের বাচ্চা নামটাই পছন্দ। এই নামটার মাঝে একটা ক্যারেক্ট্যার আছে। ব্ল্যা-ক-হো-লে-র বা-চ-চা।" কথা শেষ করে মানুষটা হা হা করে হাসল। তখন দেখলাম তার মুখের ভিতর অনেকগুলো সোনার দাঁত, দেখে কেমন যেন ভয় ভয় লাগে। মনে হয় এটা মানুষের মুখ না এটা রাক্ষসের মুখ।

মানুষটা হঠাৎ হাসি বন্ধ করে বলল, "ইউনিভার্সের নাইটি সিক্স পার্সেন্ট আমরা জানি না সেই নাইন্টি সিক্স পার্সেন্টকে টিপে তুমি ব্ল্যাকহোল বানিয়ে ফেলেছ-- এটা কী সোজা কথা নাকী? তুমি তো অনেক কামেল মানুষ।"

ঝুম্পা জিজ্ঞেস করল, "আপনি কেমন করে এসব কথা জেনেছেন?"

"আমি সব জানি।" মানুষটা মুখ গম্ভীর করে বলল, "এই দেশের কোথায় কী হয় কে কী কথা বলে কার সাথে কখন কী কথা বলে আমি সব জানি। এটা হচ্ছে আমার চাকরী।"

মিঠুন এই প্রথম একটা কথা বলল, "আপনি আমাদেরকে কেন ধরে এনেছেন?"

"তোমাদেরকে ধরে না আনলে কী এই রকম খোলামেলা কথা বলতে পারতাম?"

"আপনার সাথে তো আমাদের বলার কিছু নাই।"

"আছে।"

"কী কথা?"

"মিঠুনিয়াম নামটা আমার পছন্দ না। আমার পছন্দ হচ্ছে জামশেদিয়াম। বুঝেছ? জামশেদিয়াম। কেন বুঝেছ?"

আমি বললাম, "আপনার নাম জামশেদ।"

"হ্যাঁ। আমি মেজর জামশেদ। তোমাদের ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা আসলে বাচ্চা কাচ্চার জিনিষ না। এটা হচ্ছে বড়দের জিনিষ। তাই এটা বড়দের হাতে থাকা ভাল। এটার নামও হওয়া উচিত বড়দের নামে। বুঝেছ?"

আমরা কেউ কোনো কথা বললাম না। জামশেদ নামের মানুষটা গম্ভীর মুখে বলল, "এখন এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলি। জিনিষটা খুব সহজে কীভাবে করা যায় বল দেখি?"

আমি বললাম, "এটা করা সম্ভব না। এটা মিঠুন আবিষ্কার করেছে এটা সবসময়ে মিঠুনের নামে থাকবে।"

মানুষটা আমার কথা শুনে খুব অবাক হয়েছে এরকম ভাব করে বলল, "ও আচ্ছা! তাই নাকী?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "হ্যাঁ।"

"তোমার নামটা যেন কী? বগা নাকি ইবু?"

"ইবু।"

"শোনো ইবু– আমি বেয়াদপ ছেলে ছোকড়া পছন্দ করি না। বুঝেছ? এখন থেকে আমি পারমিশান না দিলে কোনো কথা বলবে না। শুধু শুনে যাবে। বুঝেছ?"

আমরা কেউ কোনো কথা বললাম না। জামশেদ নামের মানুষটা বলল, "আমি তোমাদের ফ্লাইং মেশিন তুলে নিয়ে এসেছি। এর ভিতরে আছে তোমাদের ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা। দড়ি দিয়ে বাঁধা এই যন্ত্র খুলে সেই ব্লাকহোলের বাচ্চা বের করতে সময় লাগবে পনেরো মিনিট। কাজেই ধরে নাও ব্ল্যাকহোলের বাচ্চাটা এখন আমার। আমি এখন তোমাদেরকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারি। কেন বের করছি না বল দেখি?"

আমরা কোনো কথা বললাম না। জামশেদ বলল, "ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করছি না কারণ বের হয়েই যদি ইন্দুরের বাচ্চার মত প্যানপ্যানানী শুরু কর? কোনো ফাজিল সাংবাদিকেরা যদি তোমাদের কথা বিশ্বাস করে ফেলে? সেই ছাগল সাংবাদিক যদি তোমাদের কথা বিশ্বাস করে রিপোর্ট করে ফেলে তখন একটা কাজ বাড়বে। রিপোর্টারকে ফিনিস করতে হবে। সেইটা

অবশ্যি সমস্যা না, আমি মাসে দুই চারটা সাংবাদিক জুতো দিয়ে পিশে ফেলি।" কথা শেষ করে মানুষটা চেয়ারে তার পা দিয়ে পিষে ফেলার অভিনয় করে দেখাল।

মেজর জামশেদ নামে মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার শরীরটা কেমন যেন শির শির করতে থাকে। সর্বনাশ! কি ভয়ংকর মানুষ।

জামশেদ একটু দম নিল তারপর বলল, "কাজেই আমাকে একটা জিনিষ নিশ্চিত করতে হবে, সেটা হচ্ছে তোমরা এখান থেকে বের হয়ে যেন আলতু ফালতু কথা না বল। বুঝেছ? আমার কথা বুঝেছ?"

তার কথা বুঝতে আমাদের কোনো সমস্যা হল না। কিন্তু আমরা কোনো কথা বললাম না, চুপ করে রইলাম। জামশেদ আরেকটা কী কথা বলার জন্যে তার চকচকে সোনার দাঁত বের করে মুখ হা করল ঠিক তখন তার টেলিফোন বাজল। সে টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন কাচুমাচু হয়ে গেল। টেলিফোনটা ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে হড়বড় করে বলল, "ইয়েস স্যার। স্লামালিকুম স্যার।"

টেলিফোনের অন্য পাশ দিয়ে কে কী বলছে আমরা শুনতে পেলাম না কিন্তু মনে হল মানুষটা অনেক বড় অফিসার আর সেই বড় অফিসার জামশেদকে একটা ধমক দিল। জামশেদ আরো কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "সরি স্যার। ভুল হয়ে গেছে স্যার। ছেলেমেয়েগুলোকে রিকভার করে ভেহিকেলটা নিয়ে ফিরে আসতে আসতে দেরী হয়ে গেছে স্যার। আই অ্যাম সরি স্যার আমার আরো আগে রিপোর্ট করা উচিৎ ছিল স্যার। আর ভুল হবে না স্যার।"

মনে হল বড় অফিসারটা বলল যে সে আমাদের দেখতে আসবে সেটা শুনে জামসেদ খুব ব্যস্ত হয়ে বলল, "না না না স্যার। আপনার আসার কোনো দরকার নাই স্যার। কোনো দরকার নাই স্যার। দে আর লাইক স্ট্রীট আরচিন। স্যার, মহব্বতজান স্কুলের ছাত্র তাই বুঝতেই পারছেন চাল চুলো নেই কিছু বদ ছেলে মেয়ে স্যার। নো ডিসিপ্লিন ইন লাইফ স্যার। স্যার, ওদের দেখলে আপনার মন খারাপ হবে স্যার।"

জামশেদ মনে হল তার বড় অফিসারকে খুব ভয় পায়। প্রত্যেকটি বাক্যের আগে এবং পরে স্যার বলছে। তার বড় অফিসার মনে হয় ফ্লাইং মেশিন নিয়ে কিছু একটা জিজ্ঞেস করল, কারণ জামশেদ মুখ শক্ত কর বলল, "নো স্যার। আকাশে ওড়ার ভেহিকেলটা ইজ নট সায়েন্টিফিক স্যার। এই

বদ ছেলেমেয়ে গুলোর মাথায় অনেক বদবুদ্ধি স্যার। একটা ঝুড়ির সাথে হান্ড্রেডস এন্ড হান্ড্রেডস অফ বেলুন লাগিয়েছে স্যার। গ্যাস বেলুন। এতো বেলুন কোথা থেকে ম্যানেজ করেছে গড অনলি নোজ স্যার। আমাদের রাডারে বেলুন ধরা পড়েনি, শুধু ঝুড়ি আর ঝুড়ির মাঝে ছেলে মেয়েগুলো ধরা পড়েছে। সেই জন্যে মনে হয়েছে কোনো ধরণের ফ্লাইং মেশিন স্যার। আসলে খুব ডেঞ্জারাস একটা সিচুয়েশন স্যার। স্যার, চরম পাবলিক নুইসেন্স স্যার। যে কোনো রকম একসিডেন্ট হয়ে যেতে পারত স্যার। বদ ছেলেমেয়ে গুলো মারা যেতে পারত স্যার। তাদের খুব কপাল ভাল আমরা তাদের রক্ষা করেছি স্যার।"

আমাদের মনে হল জামশেদের বড় অফিসার এবারে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা নিয়ে কোনো একটা প্রশ্ন করল, জামশেদ তখন হা হা করে হাসার মত একটা শব্দ করল, বলল, "স্যার এটা একটা জোক স্যার। মাইক্রো ব্লাকহোল, মাস এনার্জী কনভারসান এগুলো একেবারেই বাজে কথা স্যার। এই ছেলেমেয়েগুলো এই কথাগুলোর মানে জানা দূরে থাকুক শব্দগুলো বানানই করতে পারবে না স্যার। নিজেদের ভিতরে এগুলো নিয়ে কথা বলতো, ভাব দেখাতো স্যার। ফাজিল ছেলেমেয়ে তো, কী বলে কী না বলে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই স্যার।"

বড় অফিসার মনে হল জামশেদের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করল না। জামশেদকে অনেকভাবে বোঝাতে হল যে আমরা খুবই ফালতু টাইপের ছেলে মেয়ে একটা ঝুড়ির মাঝে অনেকগুলো গ্যাস বেলুন বেঁধে আকাশে উড়ে গেছি। শেষ পর্যন্ত মনে হয় অফিসারটা জামশেদের কথা বিশ্বাস করল। জামশেদ তখন বলল, "এই ছেলেমেয়েগুলোকে আজ রাত আটকে রেখে কাল ছেড়ে দিব স্যার। স্কুলে বাসায় সব জায়গায় ওয়ার্নিং দিয়ে দেব স্যার। স্যার আপনি কোনো চিন্তা করবেন না স্যার। আমি সব ব্যবস্থা করব স্যার। এই ছেলে মেয়েগুলো খুবই ফালতু এদেরকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া ঠিক হবে না স্যার।"

জামশেদ ঠিক যখন টেলিফোনটা রেখে দেবে তখন ঝুম্পা চিৎকার করে উঠল, "মিথ্যা কথা ! সব মিথ্যা কথা।"

জামশেদ সাথে সাথে টেলিফোনে মাইক্রোফোনটা হাত দিয়ে চেপে ধরে যেন ঝুম্পার কথাটা অন্যদিকে শুনতে না পায়। বড় অফিসার শুনতে পেলো কী না বোঝা গেল না জামশেদ টেলিফোনটা কানে লাগিয়ে কিছু

একটা শুনল, তারপর টেলিফোনটা বন্ধ করে কিছুক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর টেলিফোনটা পকেটে রেখে ঝুম্পার দিকে তাকিয়ে হিংস্র গলায় বলল, "তোর এতো বড় সাহস?"

ঝুম্পা বলল, "আমি জানি। এইটা আমার বড় সমস্যা।"

"তোর কল্লা আমি ছিড়ে ফেলব।"

"সমস্যা নাই। আমার কল্লা আমার কোনো কাজে লাগে না।"

জামশেদ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না, ঝুম্পার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল, তারপর তার সোনার দাঁত কিড়মিড় কিড়মিড় করতে করতে ঝুম্পার দিকে এগিয়ে এল। কাছাকাছি এসে খপ করে ঝুম্পার চুল ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু হঠাৎ কী ঘটে গেল বুঝতে পারলাম না, দেখলাম "বাবাগো" বলে জামশেদ তার দুই পায়ের মাঝখানে ধরে মাটিতে পড়ে গেছে। ঝুম্পা প্রচণ্ড একটা লাথি মেরেছে, এমন বেকায়দা জায়গায় মেরেছে যে জামশেদের মতন মানুষ পর্যন্ত কাবু হয়ে গেছে।

জামশেদ চোখ বন্ধ করে কয়েকটা নিশ্বাস নিল, তারপর ডান হাত পকেটে ঢুকিয়ে একটা রিভলবার বের করে আনে। রিভলবারটা সরাসরি ঝুম্পার দিকে তাক করে ঝুম্পাকে অসম্ভব খারাপ একটা গালি দিল, তারপর বলল, "বেজন্মা কোথাকার। তুই জানিস না তুই কী করেছিস? আমাকে তুই চিনিস না?"

জামশেদ কী করত আমরা জানি না— মনে হয় আসলেই গুলী করে দিত, কিন্তু ঠিক তখন জামশেদের পকেটে টেলিফোনটা বেজে উঠে। জামশেদ এক হাতে রিভলবারটা ঝুম্পার দিকে তাক করে অন্য হাতে টেলিফোনটা বের করে নম্বরটা দেখল সাথে সাথে তার মুখের চেহারা পাল্টে গেল। যে টেলিফোনটা নিজের কানে লাগিয়ে চাপা গলায় বলল, "ইয়েস।"

জামশেদ টেলিফোনটা হাত দিয়ে আড়াল করে রেখে চাপা গলায় কথা বলতে থাকে। কথা বলে ইংরেজীতে ইংরেজী আমি ভালো বুঝি না। কী বলছে আমরা ভালো করে শুনতেও পাচ্ছি না, সে কষ্ট করে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের এক কোনায় সরে গেল। কথা শুনতে না পারলেও আমাদের বুঝতে সমস্যা হল না যে কোনো কিছু নিয়ে দর কষাকষি হচ্ছে, "মিলিওন ডলার" কথাটা মনে হয় কয়েকবার বলা হল। আরেকটা শব্দ শুনতে পেলাম সেটা হচ্ছে "নিউক্লিয়ার বম্ব"।

জামশেদ কথা শেষ করে আমাদের দিকে তাকাল, তার মুখ দেখে মনে

হল সে আপাতত ঝুম্পাকে শাস্তি দেওয়ার চিন্তা বাদ দিয়েছে। তার চোখে মুখে এক ধরনের অস্থিরতা। রিভলবারটা মিঠুনের দিকে তাক করে বলল, "সাইনটিস্ট! তোকে দশ মিনিট সময় দিচ্ছি। এর মাঝে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা বের করে আমার হাতে দিতে হবে। আয় আমার সাথে।"

জামশেদ একটু আগে আমাদের সাথে তুমি তুমি করে বলছিল, বেকায়দা জায়গায় ঝুম্পার লাথি খেয়ে এখন তুই তুই করে বলছে। জামশেদ রিভলবারটা দিয়ে মিঠুনকে আবার ইঙ্গিত করল, "আয় তাড়াতাড়ি।"

মিঠুন মাথা নাড়ল, বলল, "সম্ভব না।"

জামশেদ মুখ খিঁচিয়ে বলল, "আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। আয়।"

মিঠুন বলল, "ফ্লাইং মেশিন বানাতে কয়েক সপ্তাহ লেগেছে আমি দশ মিনিটে সেটা কেমন করে খুলে ফেলব?"

"পুরোটা খুলতে কে বলেছে? শুধু ব্ল্যাকহোলের বাচ্চাটা খুলে আমাকে দিবি। আয় আমার সাথে।"

মিঠুন নড়ল না। জামশেদ তখন রিভলবারটা ঝুম্পার দিকে তাক করল, বলল, "আমি দশ পর্যন্ত গুনব। এর মাঝে যদি না আসিস এই বেজন্মাকে গুলি করে দিব।"

ঝুম্পা বলল, "এর কথা বিশ্বাস করিস না মিঠুন। গুলি করা এতো সোজা না।"

আমরা ঝুম্পার সাহস দেখে অবাক হলাম। ঝুম্পা ঠিকই বলে, এই সাহসটাই তার বড় সমস্যা। জামশেদ গুনতে শুরু করল আর পাঁচ পর্যন্ত যেতেই মিঠুন বলল, "ঠিক আছে আমি চেষ্টা করতে পারি।"

জামশেদ বলল, "আয় তাহলে। অন্য সবাই এই ঘরের মাঝে থাক।"

মিঠুন বলল, "একা আমার পক্ষে সম্ভব না। সবাইকে লাগবে।"

জামশেদ ধমক দিয়ে বলল, "সবাইকে পাবি না। খালি একজনকে নিতে পারবি। কাকে নিবি?"

মিঠুন বলল, "আমার সবাইকে লাগবে। অনেক কিছু খুলতে হবে।"

জামশেদ তখন হাল ছেড়ে দিল, বলল, "ঠিক আছে, সবাই আয় তাহলে। সাবধান কেউ কোনো তেড়িবেড়ি করিবি না। খুন করে ফেলব।"

আমরা একে একে ঘর থেকে বের হলাম। জামশেদ কেমন জানি ছটফট করছে, মনে হতে থাকে হঠাৎ করে তার ভেতরে কোনো একটা তাড়া

চলে এসেছে। আমাদের মাথার পিছনে রিভলবারটা ধরে আমাদেরকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে আনে। তারপর বারান্দা দিয়ে আমাদের হাঁটিয়ে নিয়ে গেল। ঘরের শেষ মাথায় হলঘরের মত একটা ঘরের সামনে গিয়ে সে চাবি দিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। সুইচ টিপে আলো জ্বালাতেই আমরা দেখতে পেলাম ঘরের মাঝখানে আমাদের ফ্লাইং মেশিন। জামশেদ কাছাকাছি রাখা ছোট একটা টেবিলের ওপর থেকে একটা টুল বক্স নিয়ে মিঠুনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "নে, খোল।"

মিঠুন টুল বক্সটা মেঝেতে উপুর করে ঢেলে দিল, চারিদিকে স্ক্রু ড্রাইভার, প্লায়ার্স, ফাইল, হ্যাকস, সল্ডারিং আয়রণ এইসব ছাড়িয়ে পড়ল। মিঠুন মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ এগুলো দেখল তারপর একটা ডায়াগনাল কাটার নিয়ে কাজ শুরু করে দিল। জামশেদ পা দাপিয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি।"

মিঠুন ফ্লাইং মেশিনের তলায় ঢুকে কিছু জিনিষ কেটে ফেলল। স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে বেশ কয়েকটা স্ক্রু নিচের অংশটা নামিয়ে আনে। আমরা মিঠুনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলাম, তার কাজে তাকে সাহায্য করতে লাগলাম। ফ্লাইং মেশিন ওড়ার সময় যে টিউবগুলো দিয়ে আগুনের মত গরম বাতাস বের হয় সেটা খোলার পর মূল ইঞ্জিনটা চোখে পড়ল। স্টেনলেস স্টিলের একটা সিলিন্ডার সেখান থেকে অনেকগুলো তার বের হয়ে এসেছে। মিঠুন সাবধানে সিলিন্ডার আর তার বের করে আনে, তারের এক মাথায় কয়েকটা নয় ভোল্টের ব্যাটারী ঝুলছে।

মিঠুন সব কিছু মেঝেতে রেখে জামশেদকে বলল, "এই যে এখানে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা।"

জামশেদ অধৈর্য হয়ে বলল, "এতো বড় সিলিন্ডার কেমন করে নিব। খুলে বের করে দে যেন পকেটে নেয়া যায়। আমি জানি তুই এটা পকেটে নিয়ে ঘুরিস। তোদের সব কথা আমার রেকর্ড করা আছে।"

কাজেই মিঠুন সিলিন্ডারটা খুলতে শুরু করে, ভেতরে ছোট একটা শিশি যার দুই পাশে এলুমিনিয়ামের ফয়েল লাগানো সেখান থেকে দুটো তার বের হয়ে এসেছে, সেগুলো ব্যাটারীর সাথে লাগানো। তার দুটো একসাথে করলেই বোতল থেকে আগুনের হলকার মত প্লাজমা বের হয়ে আসবে। যদি কোনোভাবে শিশিটা জামশেদের দিকে মুখ করে তার দুটি ছুইয়ে দেয়া যায় তাহলেই জামশেদ পুড়ে কাবাব হয়ে যাবে। কিন্তু একটা মানুষকে পুড়িয়ে

মারা মিঠুনের পক্ষে কিংবা আমার পক্ষে সম্ভব না। আমাদের হাতে এতো বড় একটা অস্ত্র তারপরেও আমরা কিছু করতে পারছি না, জামশেদ আমাদের মাথার পিছনে রিভলবার ধরে রেখেছে, ব্যাপারটা সেও জানে।

মিঠুন বলল, "এই শিশির ভেতরে, ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা আছে।"

"প্রমাণ করে দেখা।"

"খুব ডেঞ্জারাস। একসিডেন্ট হতে পারে।"

"আই ডোন্ট কেয়ার। কানেকশান দিয়ে দেখা ভেতর থেকে এনার্জী বের হয় তা না হলে খুন করে ফেলব।"

আমি বললাম "মিঠুন, আমাকে শিশিটা দে আমি ধরে রাখি। তুই কানেকশান দে।"

"ছেড়ে দিস না যেন। অনেক জোরে ধাক্কা দিবে।"

"ছাড়ব না।"

মিঠুন তখন আমার হাতে শিশিটা দিয়ে তার দুটো এক মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করল। আমার মনে হল হঠাৎ করে শিশিটা ধাক্কা দিয়ে পিছনে যেতে চাইছে, আমি শক্ত করে ধরে রাখলাম আর তখন ভেতর থেকে নীল রংয়ের আলোর একটা ঝলকানী বের হয়ে সাপের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ছাদকে আঘাত করল। ছাদ থেকে কিছু প্যালেস্তারা ঝুরঝুর করে নিচে খসে পড়ল।

জামশেদের মুখে বিচিত্র একটা হাসি ফুটে উঠল, জিব দিয়ে সুড়ুৎ করে ঝোল টেনে নেয়ার মত শব্দ করে বলল, "চমৎকার। এখন ব্যাটারীর কানেকশন খুলে দে।"

মিঠুন শিশির সাথে লাগানো ব্যাটারী তার এলুমিনিয়াম ফয়েল সবকিছু দেখে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "সময় লাগবে। শিশিটা ভেঙ্গে যেতে পারে এটা এইভাবে খোলা যাবে না।"

"কেন খোলা যাবে না?"

"এটা পুরোপুরি একটা সার্কিট। একটিভ সার্কিট। হঠাৎ করে টেনে খুলে দিলে যদি একটা ভোল্টেজ সার্জ যায় আমরা সবাই উড়ে যাব। ছোটখাট একটা নিউক্লিয়ার বোমা হয়ে যাবে। এটা এভাবেই নিতে হবে, শুধু লক্ষ রাখতে হবে যেন তার দুটো ছুঁয়ে না যায়, কিংবা সার্কিটে হাত না লাগে।"

জামশেদের কথাটা পছন্দ হল না, হুংকার দিয়ে বলল, "আমি এতো কথা বুঝি না। সবকিছু খুলে দিয়ে শুধু শিশিটা দে।"

"সম্ভব না। আপনি সাবধানে নিয়ে যান তাহলেই তো হল—"

ঠিক তখন বাইরে একটা গাড়ীর শব্দ হল আর সাথে সাথে জামশেদের মুখটা কেমন যেন ফ্যাকশে হয়ে গেল। জামশেদ বলল, "ওহ নো!"

আমাদেরকে কেউ বলে দেয়নি, কিন্তু আমরা হঠাৎ বুঝে গেলাম জামশেদের বড় অফিসার নিজের চোখে সবকিছু দেখার জন্যে চলে এসেছেন। জামশেদ হাত বাড়াল, "শিশিটা দে।"

শিশিটা আমার হাতে, আমি বললাম, "দেব না।"

সাথে সাথে জামশেদ রিভলবারটা মিঠুনের মাথায় ধরল, বলল "তোরা এখনো বুঝতে পারছিস না কার সাথে কী নিয়ে ইয়ার্কী করছিস। খেলতে খেলতে এই জিনিষ তোরা তৈরী করেছিস কিন্তু এখন এটা আর খেলনা না। এটার জন্য সারা পৃথিবীর সবাই ছুটে আসছে। সময় নষ্ট করবি না। দে।"

"দেব না।"

মিঠুন বলল, "দিয়ে দে ইবু।"

"সত্যি দিয়ে দেব?"

"হ্যাঁ। দিয়ে দে।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চাটা জামশেদের হাতে তুলে দিলাম। জামশেদ এটা সাবধানে নিল তারপর বুক পকেটে রাখল, তার দুটো সরিয়ে রাখল যেন একটা আরেকটার সাথে ভুলে লেগে না যায়। তারপর রিভলবারটা প্যান্টে গুজে নিয়ে ঘর থেকে বের হল।

আমরাও পিছন পিছন বের হলাম, দেখলাম বাসার সামনে একটা জীপ থেমেছে আর সেখান থেকে মাঝ বয়সী একজন মানুষ নেমে আসছে। মানুষটি জামশেদকে দেখে বলল, "এই যে জামশেদ। আমি তোমাকে খুঁজছি।"

"জী স্যার।" জামশেদ বলল, "জী স্যার ইয়ে মানে আমি স্যার—"

"ছেলে-মেয়েগুলো কোথায়? তোমার সাথে যখন কথা বলছিলাম তখন মনে হল পিছন থেকে একটা বাচ্চা—"

"জী স্যার। জী স্যার। বাচ্চা আছে স্যার। জামশেদ হাত দিয়ে সাবধানে বুক পকেটটা ধরে রেখে বলল, "আমি আসছি স্যার।"

"তুমি আসছ মানে?" কোথা থেকে আসছ? আমি ছেলেমেয়েগুলোকে দেখতে চাই।"

"অবশ্যই দেখবেন স্যার।" বলে জামশেদ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে

যেতে থাকে। আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, সে এক্ষুণি এক দৌড় দিয়ে পকেটে করে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে যাবে। আমি তখন চিৎকার করে বললাম, "ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ধর ধর।"

ধর ধর কথাটাতে একটা ম্যাজিক আছে। যখনই ধর ধর বলা হয় তখনই যাকে বলা হয় সে কেমন জানি ভয় পেয়ে জান নিয়ে পালাতে থাকে। এখানেও তাই হল, হঠাৎ করে জামশেদ চোরের মত পালাতে শুরু করল আর আমরা ধর ধর বলে তাকে ধাওয়া করতে লাগলাম। সবার আগে ছুটে গেল ঝুম্পা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম সে যে কোনো মুহূর্তে জামশেদকে ল্যাণ্ড মেরে নিচে ফেলে দিয়ে ঝুম্পা বুকের উপর চেপে বসবে।

তখন যেটা ভয় পাচ্ছিলাম ঠিক সেটা ঘটল। জামশেদ হঠাৎ দাড়িয়ে বলল, "খামোশ।" তারপর প্যান্টে গুঁজে রাখা রিভলবারটা বের করে আমাদের দিকে তাক করে ধরে বলল, "এক পা এগোলেই শেষ করে দেব।" বলে সে যে ঠাট্টা করছে না সেটা বোঝানোর জন্যে রিভলবারটা দিয়ে উপরের দিকে গুলি করল। গুলির শব্দ শুনে আমরা সবাই কেমন যেন ভ্যাবেচেকা খেয়ে গেলাম।

জামশেদকে হঠাৎ কেমন যেন হিংস্র দেখায়— সে রিভলবারটি এদিক সেদিক নাড়তে থাকে তারপর গাড়ীর ড্রাইভারের দিকে তাক করে বলল, "চাবি।"

ড্রাইভার বলল, "চাবি? কেন?"

জামশেদ হুংকার দিল, বলল, "কথা বলবে না, চাবি দাও।"

ড্রাইভার বড় অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলল, "স্যার কী করব?"

"দিয়ে দাও। চাবিটা দিয়ে দাও।"

ড্রাইভার পকেট থেকে চাবিটা বের করে জামশেদের হাতে ধরিয়ে দিল।

জামশেদ গাড়ীটার দরজা খুলে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করল, ঠিক তখন ঝুম্পা ছুটে গিয়ে চিৎকার করে পিছন থেকে জামশেদের গলা ধরে ঝুলে পড়ল।

সাথে সাথে একটা তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল, জামশেদ ঝুম্পাকে ঝেড়ে ফেলার জন্যে একটা ঝাঁকুনি দিল, কোনো লাভ হল না। ঝুম্পা ঝুলেই রইল। আমরাও ছুটে গেলাম জামশেদকে ধরার চেষ্টা করলাম, আর এই হুটোপুটির মাঝে গাড়ীর ড্রাইভার জামশেদের মুখে একটা ঘুষি মেরে দিল।

বগা তার চিকন পা দিয়ে জামশদকে লাথি দিল, আর বারান্দা থেকে বড় অফিসার, "সাবধান! সাবধান! গুলি করে দেবে— গুলি করে দেবে—" বলে চিৎকার করতে করতে নিচে নেমে এলেন।

জামশেদ সত্যি সত্যি কয়েকটা গুলি করল, কিন্তু কপাল ভালো সেটা কারো গায়ে লাগল না। ড্রাইভার জামশেদকে আরেকটা ঘুষি দিয়ে তাকে চেপে ধরল, বড় অফিসার এসে জামশেদের রিভলবার ধরে রাখা হাতটা মুচড়ে ধরলেন আর জামশেদ যন্ত্রণার শব্দ করে রিভলবারটা ছেড়ে দিল।

সারাক্ষণ মিঠুন চিৎকার করে যাচ্ছিল, জামশেদকে নিয়ে হুটোপুটির কারণে কেউ তার চিৎকার শুনতে পাচ্ছিল না, জামশেদকে কাবু করার পর সবাই তার চিৎকার শুনতে পেল সে বলছে, "পকেটে ব্ল্যাক হোলের বাচ্চা— পকেটে ব্ল্যাক হোলের বাচ্চা— সাবধান!"

জামশেদকে ড্রাইভার এবং আমরা সবাই চেপে ধরে রেখেছি, বড় অফিসারের হাতে রিভলবার। রিভলবার হাতে ধরে রেখে বড় অফিসার জামশেদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন— তারপর বললেন, "তুমি? জামশেদ, তুমি? কী করছ তুমি? কী করছ?"

জামশেদ মাথা নিচু করে ফেলল। বড় অফিসার গিয়ে তার বুকের কাপড়টা খপ করে ধরলেন, মিঠুন চিলের মত চিৎকার করে উঠল ঠিক তখন জামশেদের পকেটে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা থেকে হুশ করে ভয়ংকর প্লাজমা বের হয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে বের হয়ে এল, জামশেদ একটা গগন বিদারী চিৎকার করে তার মাথা সরিয়ে নিল কিন্তু ততক্ষণে তার একটা কান ঝলসে গেছে, ভুরু মাথার চুল পুড়ে মূহুর্তের মাঝে তাকে অদ্ভুত একটা কাক তাড়ুয়ার মত দেখাতে লাগল।

বড় অফিসার লাফিয়ে পিছনে সরে এলেন, মিঠুন চিৎকার করে বলল, "সাবধান! সাবধান!"

তারপর সে খুব সাবধানে জামশেদের পকেট থেকে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চাটা বের করে আনল। জামশেদ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নড়ল না, আবার হুশ করে প্লাজমা বের হয়ে তার চোখ মুখ ঝলসে দেবে সে তার ঝুঁকি নিল না।

এর মাঝে মিলিটারীর পোষাক পরা আরো কিছু মানুষ চলে এসেছে তারা জামশেদকে ধরে নিয়ে গেল। মুখের একপাশে ঝলসে গিয়ে তাকে এখন কেমন জানি কার্টুনের মত দেখাতে থাকে। বড় অফিসারটা আরো কিছু

ফোন করলেন এবং আমরা তখন বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে থাকলাম। জরুরী কাজকর্ম শেষ করে বড় অফিসার আমাদের দিকে তাকালেন, বললেন, "আমি কর্নেল কায়েস। আমাকে বলবে কী হয়েছে?"

বগা বলল, "খিদে পেয়েছে স্যার।"

ঝুম্পা বলল, "আজকে যখন বাসায় যাব মামী আমাকে খুন করে ফেলবে।"

কর্নেল কায়েস ঝুম্পার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বললেন, "ইয়াং লেডি তোমাকে যেটুকু দেখেছি তাতে মনে হয় না তোমাকে কেউ কখনো খুন করতে পারবে না। তারপরও বলছি, তোমার মামী যেন তোমাকে খুন করতে না পারেন আমি সেটা দেখব। আমার উপর ছেড়ে দাও।"

ঝুম্পা বলল, "বাঁচা গেল।"

কর্নেল কায়েস তখন টেলিফোনে কোথায় জানি খাবারের অর্ডার দিলেন, বললেন, "কুইক। দশ মিনিটের মাঝে ডেলিভারী চাই।" তারপর আবার আমাদের দিকে তাকালেন, বললেন, "তোমদের ওপর আমার লোকজন যে অত্যাচার করছে আমি সেজন্যে ক্ষমা চাইছি। আই এম রিয়েলী সরি।"

একজন বড় মানুষ গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এভাবে কথা বললে উত্তরে কী বলতে হয় আমরা জানি না, ফারা বলল, "না-না স্যার, আপনি কেন ক্ষমা চাইবেন। আপনার কী দোষ?"

"আমার অফিসার যদি অন্যায় করে তার দায় দায়িত্ব আমার। জামশেদ কিন্তু খারাপ অফিসার ছিল না, কিন্তু তোমরা যেটাকে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা বলছ সেটা নিশ্চই অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিষ— এর ভেতরে নিশ্চয়ই মিলিওন মিলিওন ডলার আছে তাই লোভের কারণে এটা ঘটেছে। যখন আমরা টের পেয়েছি তোমরা আকাশে ওড়াওড়ি করছ তখন থেকে আমাদের ইন্টেলিজেন্স দিয়ে তোমাদের কথাবার্তা রেকর্ড করেছি তোমাদের ব্যাগে মাইক্রোট্রান্সমিটার বসিয়েছি। আমি অনেক কথা শুনেছি এবং খুবই অবাক হয়েছি। তারপর তো দেখতেই পেলে কী হয়েছে। যাই হোক এখন বল দেখি কী হচ্ছে। তোমাদের মুখ থেকে শুনি।"

আমরা কর্নেল কায়েসকে সবকিছু বললাম, কোনো কিছু গোপন করলাম না। মিঠুন সবকিছুই একটু একটু করে বলে তখন আমাদের সেটা বেশী বেশী করে বলতে হয়। কর্নেল কায়েস সবকিছু শুনে অবিশ্বাসের

ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বললেন, "ও মাই গুডনেস ! কী আশ্চর্য !"

তারপর বেশ কিছুক্ষণ নিজের মনে কিছু একটা চিন্তা করলেন তারপর বললেন, "তোমরা যেটাকে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা বলছ সেটা যেহেতু তোমরা আবিষ্কার করেছ কাজেই এটার মালিক তোমরা। কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। এটা থেকে যতখুশী সম্ভব এনার্জী পাওয়া যাবে সে জন্যে নয়, এটা দিয়ে অস্ত্র তৈরি করা যাবে সেজন্যে। এখন আমরা এটাকে তোমাদের কাছে রাখতে দেব কারণ এটাকে সেফলি কীভাবে রাখা যায় সেটা তোমরাই সবচেয়ে ভালো জান। তোমরা ছোট হলেও তোমাদের যথেষ্ট দায়িত্ববোধ আছে।"

আমাদেরকে নিয়ে কেউ কখনো কোনো প্রশংসার কথা বলে না তাই কর্নেল কায়েসের কথাগুলো শুনে আমাদের খুব অস্বস্তি হতে থাকে। আমরা একটু নড়ে চড়ে বসলাম। কী বলব বুঝতে পারলাম না।

কর্নেল কায়েস বললেন, "আমরা পুরো বিষয়টা নিয়ে একটু চিন্তা করি— তারপর তোমাদের ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা নিয়ে কী করা যায় সেটা নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। যতক্ষণ সিদ্ধান্ত নেয়া না হচ্ছে তোমাদের কাছে রেখো— তোমাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই আমি আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে তোমাদের প্রটেকশান দিব।"

বড় মানুষেরা যেভাবে গুরুগম্ভীর আলোচনার পর গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে আমরা সেভাবে মাথা নাড়লাম। তারপর কর্নেল কায়েস তার গাড়ী করে আমাদের সবাইকে বাসায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আমাদেরকে তার গাড়ীতে তুলে নিলেন।

পরদিন সকালে বগা এক কপি দৈনিক মহব্বত নিয়ে হাজির হল। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় করে লেখা "আকাশে রহস্যময় মহাকাশযান। দিনভর নিরাপত্তা বাহিনীর গোপনীয় কর্মকাণ্ড।" নিচে আমাদের ফ্লাইং মেশিনের ঝাপসা একটা ছবি, নিচ থেকে ক্যামেরা দিয়ে কেউ ছবি তুলেছে, ভালো করে কিছু বোঝা যায় না। খবরে অনেক কিছু আজগুবি কথা বার্তা লেখা। কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের একজন প্রফেসরের বিশাল সাক্ষাতকার। ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা নানারকম স্পেসসিপের ছবি। রহস্যময় মহাকাশযান নিয়ে অনেক রকম বানানো গল্প।

আমরা সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে দৈনিক মহব্বতটা পড়লাম। মিঠুন সাবধানে তার বুক পকেটে রাখা ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা রাখা শিশিটা ছুঁয়ে দেখে নিচু গলায় বলল, "জানাজানি হলে খুব ঝামেলা হয়ে যাবে।"

আমি বললাম, "ঝামেলার কী আছে? কর্নেল কায়েস আমাদের সব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। সমস্যাটা কী?"

মিঠুন বড় মানুষের মত একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আসলে সমস্যাটা অন্য জায়গায়।"

"কোন জায়গায়?"

ঠিক তখন আরো কয়েকজন চলে এল বলে মিঠুন আর কথাটা বলতে পারল না।

আমরা কথা বলতে বসলাম সেকেন্ড পিরিয়ডে। কোন ক্লাশে কে আছে কে নাই সেটা নিয়ে মহব্বতজান স্কুলে কেউ মাথা ঘামায় না তাই ক্লাশরুম থেকে বের হয়ে ল্যাবরেটরিতে একত্র হতে আমাদের কোনো সমস্যাই হল না।

আমরা ল্যাবরেটরি ঘরের একটা টেবিল ঘিরে বসলাম। মিঠুন পকেট থেকে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা ভরা শিশিটা টেবিলের উপর রেখে ফোঁস করে

একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, "আমি যখন প্রথম ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা তৈরী করেছিলাম তখন বুঝি নাই এটা নিয়ে এতো হই চই হবে। আরেকটু হলে আমাদের কোনো একজন মরে যেতাম।"

ঝুম্পা বলল, "মরি নাই। মরে যাওয়া এতো সোজা না।"

মিঠুন বলল, "অনেক সোজা। জামশেদ কতোগুলো গুলি করেছিল মনে আছে? যদি আমাদের কারো গায়ে লাগত?"

বগা বলল, "লাগে নাই তো।"

মিঠুন বলল, "জামশেদ কেন ব্ল্যাকহোলের বাচ্চার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল বুঝেছিস?"

বগা বলল, "বুঝেছি। এটা মিলওন ডলার দামী।"

মিঠুন বলল, "মিলিওন ডলার না। মিলিওন মিলিওন ডলার। সেটা কতো টাকা জানিস?"

ফারা মাথা নাড়ল, "জানি না। আমার বড় বড় গুণ করতে খুব বিরক্তি লাগে।"

মিঠুন বলল, "তোর বড় বড় গুণ করতে হবে না, শুধু জেনে রাখ এটা অনেক টাকা। কিন্তু বল দেখি কেন এতো টাকা?"

বগা বলল, "এটা আবার কোনো প্রশ্ন হল নাকি? এটা দিয়ে আকাশে উড়া যায়।"

মিঠুন বলল, "উহুঁ আকাশে উড়ার জন্য না। এটা দিয়ে অস্ত্র বানানো যাবে— আর আলতু ফালতু অস্ত্র না। একেবারে খাঁটি—"

আমি বললাম, "নিউক্লিয়ার বোমা?"

"হ্যাঁ। আসলে তোরা বিশ্বাস করবি, আমি—" মিঠুন বুকে থাবা দিয়ে বলল, "আমি ইচ্ছা করলে এই ল্যাবরেটরি ঘরে একটা সত্যিকারের নিউক্লিয়ার বোমা বানিয়ে ফেলতে পারব?"

ঝুম্পা বলল, "তুই?"

"হ্যাঁ। কারণটা খুবই সোজা—"

ফারা কানে হাত দিয়ে বলল, "থাক থাক এখন বৈজ্ঞানিক কচকচানি শুরু করিস না। মাথা ধরে যাবে।"

মিঠুন মুখ শক্ত করে বলল, "মোটেও বৈজ্ঞানিক কচকচানি না। খুবই সোজা জিনিষ। ইবু প্রথম তার বাসার ছাদে দেখেছিল। ব্ল্যাকহোলের বাচ্চাকে ঘিরে ইলেকট্রিক ফিল্ড দিলে ভেতর থেকে এনার্জী বের হয়।

এনার্জিটা আসে ভর থেকে, ই ইকুয়েলস টু এম সি স্কয়ার হিসেবে। যেটা দিয়ে নিউক্লিয়ার এনার্জী হয়, নিউক্লিয়ার বোমা বানায়।"

ফারা হাল ছেড়ে দেয়ায় ভঙ্গী করে মাথা নাড়ল, আর মিঠুন একটা নিশ্বাস নিয়ে বলল, "ভরকে এতো সহজে শক্তিতে রূপান্তর করা যায় এটা কী কেউ কোনোদিন চিন্তা করতে পেরেছে? শুধু ইলেকট্রিক ফিল্ড দিলেই হয়, যত বেশি ফিল্ড তত শক্তি। শুধু কী করতে হবে জানিস?"

কিছু একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করলে মিঠুন হতাশ হবে, তাই কিছু বুঝব না জানার পরেও জিজ্ঞেস করলাম, "কী করতে হবে?"

"খুব কম সময়ের জন্যে অনেক বড় একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড দিতে হবে। মাইক্রোসেকেন্ড একটা পালস দিলে কাজ হয়ে যাবে। তার মানে বুঝেছিস?"

আমরা বিশেষ কিছু বুঝি নাই কিন্তু তারপরেও জোরে জোরে মাথা নাড়লাম যেন মিঠুন আবার এটাও বোঝাতে শুরু না করে, কিন্তু লাভ হল না সে বোঝাতে শুরু করল, "তার মানে আমি ছোট একটা সার্কিট দিয়ে কয়েক ঘণ্টায় মাঝে ডেটোনেটর বানাতে পারব।"

মিঠুন হাত দিয়ে বাচ্চা ব্ল্যাকহোলের ভরা শিশিটা নিয়ে একটু নেড়ে বলল, "এখানে যে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা আছে সেটার ওজন দশ গ্রামের মত। তার মানে হচ্ছে এটা দিয়ে আমি যদি একটা নিউক্লিয়ার বোমা বানাই তাহলে সেটা কতো শক্তিশালী বোমা হবে জানিস?"

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কতো শক্তিশালী"?

"হিরোশিমায় যে বোমাটা ফেলেছিল তার থেকে দশগুণ বেশী শক্তিশালী।"

হিরোশিমায় যে বোমাটা ফেলেছিল সেটা নিশ্চয়ই অনেক শক্তিশালী, তার থেকে দশগুণ বেশী শক্তিশালী বোমা নিশ্চয়ই সোজা কথা না তাই আমরা সবাই অবাক হবার ভঙ্গী করলাম, (শুধু ফারা হালকাভাবে হাই তুলল)।

মিঠুন গম্ভীর গলায় বলল, "এই জন্যে পৃথিবীর যত টেররিস্ট, যত জঙ্গী আছে তারা যদি কোনোভাবে এই ব্ল্যাকহোলের বাচ্চার খবর পায় তাহলে এটা নেবার জন্যে পাগল হয়ে যাবে। এইজন্যে এটা মিলিওন মিলিওন ডলার দামী।"

বগা গলা খ্যাকারী দিয়ে বলল, "আমরা এখন এইটা বিক্রি করব?"

ঝুম্পা বলল, "কেমন করে বিক্রি করবি। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বলবি, ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা মাত্র মিলিওন ডলার। ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা মাত্র মিলিওন ডলার— আগে আসলে আগে পাবেন— ।"

ঝুম্পার কথা শুনে আমরা সবাই হি হি করে হাসলাম। আমি বললাম, "সেভাবে বিক্রি করতে হবে না ! কিন্তু কর্নেল কায়েস চাইলে কী গভমেন্টের কাছে বিক্রি করে ফেলতে পারবেন না? মিঠুন তাহলে বড়লোক হয়ে যাবে– আমরা মিঠুনের সাথে থাকব—"

মিঠুন চশমার ভিতর দিয়ে আমার দিকে তাকাল, বলল, "তারপর যদি এইটা দিয়ে কেউ কোনোদিন একটা বোমা বানায় আর সেই বোমার কারণে কোনো মানুষ মারা যায়?"

"তাহলে কী?"

"তাহলে সেই মানুষটাকে মারার জন্যে আমি দায়ী হব।" মিঠুন মুখ শক্ত করে বলল, "আমি মানুষ মারার জন্য দায়ী হতে চাই না।"

ফারা এতক্ষণ পর সোজা হয়ে বসল, জিজ্ঞেস করল, "তাহলে কী করবি?

"আমি ব্ল্যাকহোলের বাচ্চাটা কাউকে দিব না, এটাকে ধ্বংস করে ফেলব।"

ফারা কিছুক্ষণ মিঠুনের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর মিঠুনের পিঠে জোরে একটা থাবা দিয়ে বলল, "সাবাশ ! এই তো চাই !"

মিঠুন থাবা খেয়ে সোজা হয়ে বসল, "কী চাস?"

"তুই যেটা বলছিস ! কোনো দিন কোনো মানুষ মারার যন্ত্র বানাব না!"

আমি দুর্বল ভাবে বললাম, "তাহলে কাউকে বলবিও না?"

"না। কীভাবে বানিয়েছি সেটাও কাউকে বলব না। কেউ যেন জানতে না পারে।"

"কী ভাবে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চাকে ধ্বংস করবি?"

"অনেক গুলো উপায় আছে। সবচেয়ে সোজা হচ্ছে একটা রকেটের মতো বানিয়ে ছেড়ে দিব, পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশে চলে যাবে।"

"রকেটের মত?"

"হ্যাঁ। শক্তি খরচ করতে করতে উপরে উঠে যাবে, একসময় সব শক্তি ফুরিয়ে গেলে মহাকাশের বাচ্চাটা শেষ হয়ে যাবে।"

"কতোদিন লাগবে তৈরী করতে?"

"একেবারেই সময় লাগবে না। ফ্লাইং মেশিন তৈরী করায় সময় এভাবেই তৈরি করলাম না?"

মিঠুন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি জানি তোদের একটু একটু মন খারাপ হচ্ছে, আমরা ইচ্ছা করলেই অনেক বিখ্যাত হতে পারতাম অনেক বড়লোক হতে পারতাম, সেসব কিছু না করে ব্ল্যাকহোলের বাচ্চাটা ধ্বংস করে দিতে চাইছি। মন খারাপ হতেই পারে।"

আমি বললাম, "না মিঠুন। আমাদের একটুও মন খারাপ হচ্ছে না। তুই ঠিক কথাই বলেছিস—"

ঝুম্পা বলল, "আর আকাশে উড়তে পারব না সেজন্যে একটু মন খারাপ হচ্ছে, কিন্তু কী আর করা। তুই অন্য একটা কিছু আবিষ্কার করতে পারবি না?

মিঠুন হাসল, বলল, "পারব।"

মিঠুন বগার দিকে তাকাল, বগা হাসার চেষ্টা করে বলল, "তোরা সবাই যেটা বলবি সেটাই ঠিক আছে। তবে—"

"তবে কী?"

"হাত খরচের জন্য কিছু টাকা থাকলে খারাপ হত না।"

বগার কথা শুনে আমরা সবাই হি হি করে হাসলাম।

স্কুলের মাঠ থেকে একদিন পর আমরা ব্ল্যাকহোলের বাচ্চাটাকে মহাকাশে ছেড়ে দিয়েছিলাম। রকেটের মত জিনিষটা মিঠুন ক্লাশে নিয়ে এসেছিল, সবাই জানতে চাইল এটা কী— মিঠুন বলল, রকেট। শুনে কেউ বেশি অবাক হল না। বিজ্ঞান মেলায় চ্যাম্পিওন হওয়ার পর সবাই ধরে নিয়েছে মিঠুন যে কোন যন্ত্র বানাতে পারে। খেলনা রকেট সবাই দেখেছে, সাইকেলের পাম্প দিয়ে পাম্প করে রকেট বানিয়ে বাচ্চাদের সেই রকেট ছুড়ে দেওয়া হয়। ধরেই নিয়েছে যে সেরকম কিছু।

বিজ্ঞান ক্লাশে মিঠুন কালাপাহাড় স্যারকে বলল, "স্যার, কিছুক্ষণের জন্যে ক্লাশ ছুটি দিবেন?"

আমরা কেউ বললে স্যার আমাদের ছাতু করে ফেলতেন কিন্তু মিঠুনকে স্যার শ্রদ্ধাভক্তি করেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী জন্যে?"

মিঠুন তার হাতের রকেটটা দেখিয়ে বলল, এই যে রকেটটা বানিয়েছি

এটা ছাড়ব। সবাই দেখবে।"

"রকেট কোথায় যাবে?"

"আকাশে।"

"কারো মাথায় এসে পড়বে না তো?

"না স্যার।"

কালাপাহাড় স্যার ভুরু কুচকে বললেন, "যদি কারো মাথার উপর পড়ে তাহলে কিন্তু মামলা করে দেবে।"

"পড়বে না স্যার।"

"ঠিক আছে তাহলে।"

তখন কালাপাহাড় স্যার টেবিলে থাবা দিয়ে আমাদের ডাকলেন তারপর বললেন, "তোদের সবাইকে মিঠুন এখন রকেট ওড়ানো দেখাবে।"

পুরো ক্লাশ আনন্দের শব্দ করল। কালাপাহাড় স্যার বললেন, "কোনো গোলমাল করবি না, লাইন ধরে সব মাঠে যা!"

ছেলেমেয়েরা ভয়ংকর গোলমাল করে লাইন ধরায় কোনো চেষ্টা না করে ধাক্কাধাক্কি করে দৌড়াতে দৌড়াতে মাঠে হাজির হল। মাঠে গিয়ে দেখলাম মাঠের এক কোনায় অক্সব্রীজ স্কুলের সায়েন্স টিচার দাঁড়িয়ে আছেন, মিঠুনকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, "কী খবর মিঠুন? তুমি আমাকে আসতে বলছ, খুব জরুরী, কী হয়েছে?"

মিঠুন বলল, "স্যার মনে আছে, আপনারা আমাকে অক্সব্রীজ স্কুল থেকে বের করে দিয়েছিলেন?"

সায়েন্স স্যার একটু ইতস্তত করে বললেন, "হ্যাঁ। ইয়ে মানে ব্যাপারটা এখনো সবার কাছে রহস্যের মত। কী ঘটেছিল, তুমি কী করেছিলে?"

মিঠুন হাতের রকেটটা দেখিয়ে বলল, "আমি যে জিনিষটা তৈরী করেছিলাম সেটা এই রকেটটার ভিতরে আছে। জিনিষটা আমরা এই রকেটে করে পৃথিবীর বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"পৃ-পৃ-পৃথিবীর বাইরে?"

"জী স্যার, পরে আপনাকে সব বলব, আমি চাচ্ছিলাম এখন আপনি এটা দেখেন, আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।"

"কিন্তু— কিন্তু।"

"আপনাকে কিছু করতে হবে না শুধু দেখেন স্যার। প্লিজ।"

সায়েন্স স্যার ভ্যাবাচেকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মিঠুন ব্ল্যাকহোলের

বাচ্চা সহ রকেটটা মাঠের মাঝখানে রাখল, সবাই কাছে চলে আসছিল, আমরা ঠেলে তাদের সরানোর চেষ্টা করছিলাম লাভ হল না তখন গুললু কনুই দিয়ে গুতো দিয়ে তাদের দশ হাত দূরে সরিয়ে দিল

রকেটটাকে বসানোর জন্যে একটা ছোট প্লেটের মত আছে, সেই প্লেটে একটা সুইচ। মিঠুন সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি এই সুইচটা টিপে দেওয়ার দশ সেকেন্ড পর রকেটটা উড়বে। সবাই রেডি?"

সবাই চিৎকার করে বলল, "রেডি।"

মিঠুন সুইচটা টিপে সরে এল। ক্লাশের সবাই এক দুই তিন করে গুনতে লাগল। অক্সব্রীজ সায়েন্স টিচার তার পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে রকেটটার দিকে ধরে রেখেছেন, ছবি তুলছেন নাকী ভিডিও করছেন বুঝতে পারলাম না।

ঠিক দশ সেকেন্ড পর রকেট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল, ছোট রকেটের নিচে দিয়ে আগুনের মত কিছু একটা বের হচ্ছে আর দেখতে দেখতে রকেটটা উপরে উঠে যাচ্ছে। রকেটটা ঘিরে থাকা সব বাচ্চা আনন্দে হাত তালি দিচ্ছে-- তারা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না কী অসাধারণ একটা জিনিষকে আসলে পৃথিবী থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আমি রকেটটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, আস্তে আস্তে সেটা ছোট হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেল, আমি তবু তাকিয়েই রইলাম। ঠিক কী কারণ কে জানে আমার নিজের ভিতরে একটু দুঃখ দুঃখ লাগছিল। নিজের মনে ফিস ফিস করে বললাম, "বিদায় ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা। যেখানেই থাকিস ভালো থাকিস।"

সেদিন বিকেল বেলাতেই আমাদের স্কুল টেলিভিশন ক্যামেরা সাংবাদিক আর নানা ধরণের গাড়ীতে ভরে গেল। হেড মাস্টার নিজে এসে আমাদের কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে গেলেন, গিয়ে দেখি কর্নেল কায়েস অপেক্ষা করছেন। শত শত ক্যামেরার ফ্ল্যাশ এর মাঝখানে দিয়ে হেঁটে আমরা হেড স্যারের রুমে ঢুকলাম। কর্নেল কায়েস মিঠুনকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে বলবে? একটা গুজব শুনছি তুমি ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা রকেটে করে পৃথিবীর বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছ। এটা কী সত্যি?"

"জী স্যার।" মিঠুন মাথা নাড়ল, "এটা সত্যি।"

"কেন?"

"এটা দিয়ে বোমা বানানো যেতো স্যার। আমরা চাই না কোনোদিন এটা দিয়ে বোমা বানানো হোক আর সেই বোমা দিয়ে কোনো মানুষ মারা যাক।"

কর্নেল কায়েস কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। খুব ধীরে ধীরে তার মুখটা কেমন যেন নরম হয়ে গেল, মুখের কোনায় বিচিত্র একটা হাসি ফুটে উঠল, ফিস ফিস করে বললেন, "সাবাস, বাঘের বাচ্চা।"

মিঠুন জিজ্ঞেস করল, "এতো মূল্যবান একটা জিনিস নষ্ট করেছি যে জন্যে আপনি কী রাগ হয়েছেন?"

কর্নেল কায়েস মাথা নাড়লেন বললেন, "না, আমি মোটেও রাগ হইনি। আমি তোমাদের দেখে অসম্ভব খুশী হয়েছি। আমি জানি যে দেশে তোমাদের মত ছেলেমেয়েরা থাকে সেই দেশের কোনো চিন্তা নেই। আই স্যালুট ইউ।"

কথা শেষ করে কর্নেল কায়েস সত্যি সত্যি একবারে মিলিটারী কায়দায় আমাদের স্যালুট করলেন। কেউ স্যালুট করলে কী করতে হয় আমরা জানি না, আমরাও চেষ্টা করলাম তার মত স্যালুট করতে।

কর্নেল কায়েস চলে যাবার পর সাংবাদিকেরা যা একটা কাণ্ড শুরু করল সেটা আর বলার মত না। এতোদিন যা বলতে পারিনি এবারে সবকিছু বলে দিলাম, ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা, ফ্লাইং মেশিন, জামশেদের কাজ কর্ম কিছুই বাকী রাখলাম না। শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না, আমাদের ছবি তোলার জন্যে সাংবাদিকেরা নিজেদের ভেতর এমন মারামারি করল যে সেটা পর্যন্ত একটা খবর হয়ে গেল।

ব্ল্যাকহোলের বাচ্চার ঘটনা ঘটে যাবার পর আমাদের জীবনে অনেক গুলো ঘটনা ঘটল। ভালো ঘটনাগুলো এরকম :

অক্সব্রীজ স্কুলের সায়েন্স টিচার তার স্কুল ছেড়ে আমাদের স্কুল পড়াতে চলে এলেন। স্যার খুব মন দিয়ে পড়ান, আমরা জীবনের প্রথম আর্কিমিডিসের সূত্রটা বুঝতে পেরেছি।

আমাদের অনেকগুলো টক শোতে হাজির হতে হয়েছিল। টেলিভিশনে দেখাচ্ছে সেজন্যে প্রথম প্রথম আমরা বেশ নার্ভাস হয়েছিলাম, পরে যখন অভ্যাস হয়ে গেল তখন আমাদের টক শো গুলো খুব ভালো হতো। ব্ল্যাকহোলের বাচ্চার গল্পের পাশাপাশি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের পেটানো নিয়ে কথা বলার কারণে অনেক স্কুলের স্যার ম্যাডামরা নাকী ছাত্রছাত্রীদের পেটানো বন্ধ করে দিয়েছেন।

টক শোতে থাকার জন্যে টেলিভিশন চ্যানেল গুলো থেকে আমরা বেশ কিছু টাকা পয়সা পেয়েছিলাম। বগার হাত খরচের দুঃখটা মিটে গিয়েছে।

মিঠুন তার মায়ের কানের দুলে প্লাস্টিকের পাথর গুলোর জায়গায় আসল হীরা দুটি লাগিয়ে দিয়েছে। তার মা নাকী পার্থক্যটা ধরতে পারেন নাই।

কর্নেল কায়েস মাঝে মাঝে আমাদের নানা জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যান। তাঁর কাছে শুনেছি জামশেদের নাকি কোর্ট মার্শাল হয়ে গেছে। কোর্ট মার্শাল মানে কী আমরা জানি না কাকে জিজ্ঞেস করব বুঝতে পারি না।

অক্সব্রীজ স্কুলের ছেলেমেয়েরা তাদের স্কুলের প্রিন্সিপালের কাছে বিশাল দরখাস্ত করে বলেছে তাদের স্কুলটার কড়া নিয়ম কানুন কমিয়ে আমাদের স্কুলের মতো সহজ করে দিতে। এতে নাকী সৃজনশীলতা বেড়ে যায়। (হা-হা-হা হাসতে হাসতে মারা যাই।)

বাবা ক্রিকেট খেলা দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলেন,

ইবু ইবু দেখে যা, তোকে টেলিভিশনে দেখাচ্ছে। কথাটা সত্যি, মাঝে মাঝেই আমাদের টেলিভিশনে দেখায়।

বিবিসিতে আমাদের একটা সাক্ষাতকার হয়েছিল, কথাবার্তা ইংরেজীতে বলে মিঠুনই বেশি বলেছে। আমরা হুঁ হাঁ করে মাথা নেড়েছি মাঝে মাঝে ইয়েস নো বলেছি।

জার্মানি না ইতালির কোন কনফারেন্সে নাকী আমাদের ডাকবে। শোনার পর থেকে বগা কাটা চামুচ দিয়ে খাওয়া প্র্যাকটিস করছে।

এরকম ভালো খবর আরো অনেকগুলো আছে বলে শেষে করতে সময় নেবে। খারাপ খবরটা এরকম :

আমাদের ছোট শহরে কারাটের একটা স্কুল খুলেছে আর ঝুম্পা তার টক শোয়ের টাকা দিয়ে সেই স্কুলে ভর্তি হয়ে গেছে। এমনিতেই তার যন্ত্রণায় আমাদের জীবন শেষ, সে কারাটে শিখে গেলে আমাদের কী অবস্থা হবে?

খুব দুশ্চিন্তায় আছি।

জন্ম: ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে।

স্ত্রী প্রফেসর ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।

আলোকচিত্র ▪ সুব্রত ঘোষ